দেশের মূল্যবান পুরাকীর্তি
পাচার হয়ে যাচ্ছে
ধরতে হবে পাচারকারীদের...
রুদ্ধশ্বাস রহস্য উপন্যাস

কালোমূর্তি রহস্য

বাংলাপিডিএফ.নেট

হুমায়ূন কবীর ঢালী

বাংলাপিডিএফ.নেট
এক্সক্লিউসিভ!

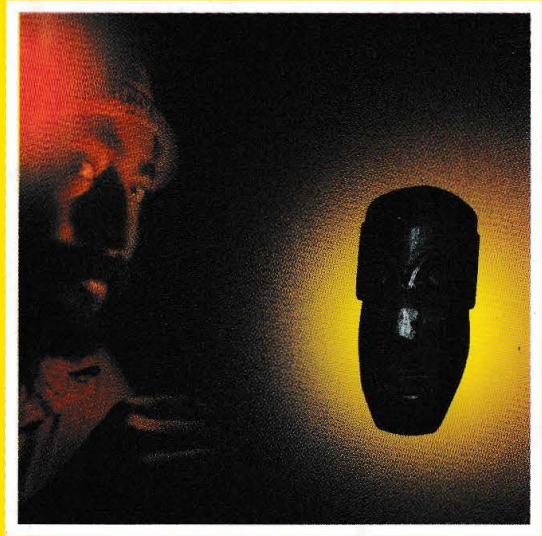

চাঁদপুর শহর থেকে কষ্টিপাথরের কয়েকটি কালোমূর্তি চুরি করে নিয়ে আসে দুর্বৃত্তরা। রাজধানীর এক আবাসিক হোটেলে আশ্রয় নেয় দুর্বৃত্তের দলটি। একই হোটেলে খুন হয় একজন। যে ছিল দুর্বৃত্তদেরই আরেকটি গ্রুপের সদস্য। খুনের খবর পৌঁছে যায় গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মি. হারিস চৌধুরীর কানে। শুরু হয়ে যায় মি. হারিসের অভিযান। অভিযান চালাতে গিয়ে সে জানতে পারে মূর্তি চুরির সাথে হোটেলের খুনের একটা যোগসূত্র রয়েছে। কী সেই যোগসূত্র? দুর্বৃত্তরা কালোমূর্তি কোথায় পাচার করবে? মি. হারিস কি পারবে পাচারকারীদের কাছ থেকে কালোমূর্তি উদ্ধার করতে? এরকম শ্বাসরুদ্ধকর এক কাহিনী আবর্তিত হয়েছে 'কালোমূর্তি রহস্য'কে ঘিরে। হুমায়ূন কবীর ঢালীর প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস। সবাইকে মুগ্ধ করবে। নিয়ে যাবে রহস্যের গভীরে।

প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ

কালোমূর্তি রহস্য

হুমায়ূন কবীর ঢালী

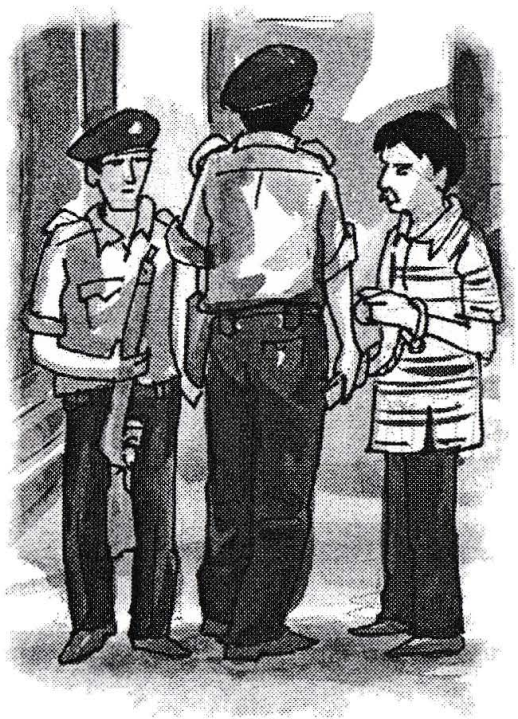

বর্ণের পর বর্ণ গাঁথি, সাজাই শব্দ স্বপ্ন দিয়ে
বাংলাপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৯, ফাল্গুন ১৪১৫

প্রকাশক
প্রকৌ. মোঃ মেহেদী হাসান

বাংলাপ্রকাশ
৩৮/২-খ তাজমহল মার্কেট (নিচতলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২০৪০৩, ৭১৭০৯০৯
E-mail : banglaprakash@gmail.com

পরিবেশক
লেকচার পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা

বিদেশে পরিবেশক
রূপসী বাংলা, ২২০ টুটিং হাই স্ট্রিট, লন্ডন
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক, আমেরিকা
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, ভারত

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অলংকরণ
মামুন হোসাইন

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স, ঢাকা

মূল্য : ১০০.০০ টাকা

Kalomurti Rohossha by Humayun Kabir Dhali, Published by Engr. Md. Mehedi Hasan, Banglaprakash (A concern of Omicon group), 38/2-Kha Tajmahal Market (Ground Floor), Banglabazar, Dhaka-1100.
Price Tk. 100.00 Only. US $ 5.00

ISBN 984-300-000-575-7

উৎসর্গ

ধ্রুব এষ

প্রিয় বন্ধু

ছোটদের জন্য
এই লেখকের আরো বই

ভূতের ছাও
কাটুস কুটুস
দুষ্টু ছেলের গল্প
পিচ্চিভূতের কাণ্ড
নীল গ্রহের রহস্য
এক যে ছিল হাঙর
এক ডজন রূপকথা
কাকের ছা কঙ্কাবতী
টিয়ে পাখির জন্মদিনে
বিলাই ম্যাঁও কাঁটা খাও
সওদাগর ও ডাইনিবুড়ি
দেশ-বিদেশের রূপকথা
মিহির আলীর ভূতরহস্য
পিচ্চিভূতের সমুদ্র বিলাস
রাখাল ও জাদুর আম গাছ
কাগুজে বাঘ ও কাঠুরে পুত্র
রাজকন্যা ও লেজকাটা বাঘ

অনুবাদ
দ্যা ব্ল্যাক ক্যাট
জুরাসিক পার্ক

সম্পাদনা
শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্প
পশুপাখি নিয়ে গল্প
নির্বাচিত ভূতের গল্প
শ্রেষ্ঠ কিশোর রূপকথা
মাকে নিয়ে একশ ছড়া
পাখির গল্প পাখির ছড়া

'কালোমূর্তি রহস্য' গোয়েন্দা উপন্যাসটি একটি দৈনিকের ঈদ সংখ্যায় প্রকাশের পর এটি বই আকারে প্রকাশের দাবি ওঠে পাঠক মহলের কাছ থেকে। সেই দাবির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে 'কালোমূর্তি রহস্য'র সাথে 'লাইট হাউজ হত্যারহস্য' নামে আরেকটি ছোট গোয়েন্দা উপন্যাস যোগ করে 'কালোমূর্তি রহস্য' বইটি প্রকাশ করা হল। আশা করি বইটি কিশোর পাঠকসহ সকল শ্রেণীর পাঠকের ভালো লাগবে।

হুমায়ূন কবীর ঢালী
e-mail kabirdhali@yahoo.com

হোটেলে খুন

স্পেশাল ব্রাঞ্চের তিনতলার নিজ অফিস রুমে বসে আছেন সিনিয়র গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মি. হারিস। তার চোখ টো টো করে বেড়াচ্ছে টেবিলে পড়ে থাকা আজকের একটি দৈনিক পত্রিকায়। তার হাত দুটো মাথার উপরে মুষ্টিবদ্ধ থাকায় মনে হচ্ছে তিনি কিছু ভাবছেন। তিনি যখন সিরিয়াস কিছু ভাবেন, তখন তার হাত দুটো ঠিক এভাবে মাথার উপরে চলে যায়। মুষ্টিবদ্ধ দুহাত জোড়া লাগিয়ে ভাবতে থাকেন। যে পর্যন্ত ভাবনায় কোনো রেজাল্ট না মিলে ততক্ষণ দুহাতের জোড়া অবিচ্ছিন্নই থাকে।

আজ অবশ্য তার ভাবনায় ফোড়ন কাটছে প্রচণ্ড গরম। কিছু একটা ভাবতে হলে বিশেষ করে তা যদি হয় সিরিয়াস কিছু, তাহলে অবশ্যই সুনসান অনুকুল পরিবেশ-পরিস্থিতির দরকার হয়। আর কারো না হলেও মি. হারিসের ভাবনার ক্ষেত্রে সুনসান পরিবেশ তো চাই।

কিন্তু প্রচণ্ড গরম রীতিমতো তাকে ডিস্ট্রাব করছে। মাথার উপরের সিলিংফ্যান গুনে গুনে ঘুরছে। ফ্যানের অপর্যাপ্ত বাতাস ইন্সপেক্টর হারিসকে যে ঠাণ্ডা করতে পারছে না, তা তার অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তিনি ঘেমে প্রায় নেয়ে উঠেছেন। তার নাক ও কপাল থেকে লবণজলের প্রবাহমানধারা অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে শরীর বেয়ে নিচের দিকে।

হারিস সাহেবের এ অবস্থা দেখে পাশের চেয়ারে বসা তার জুনিয়র

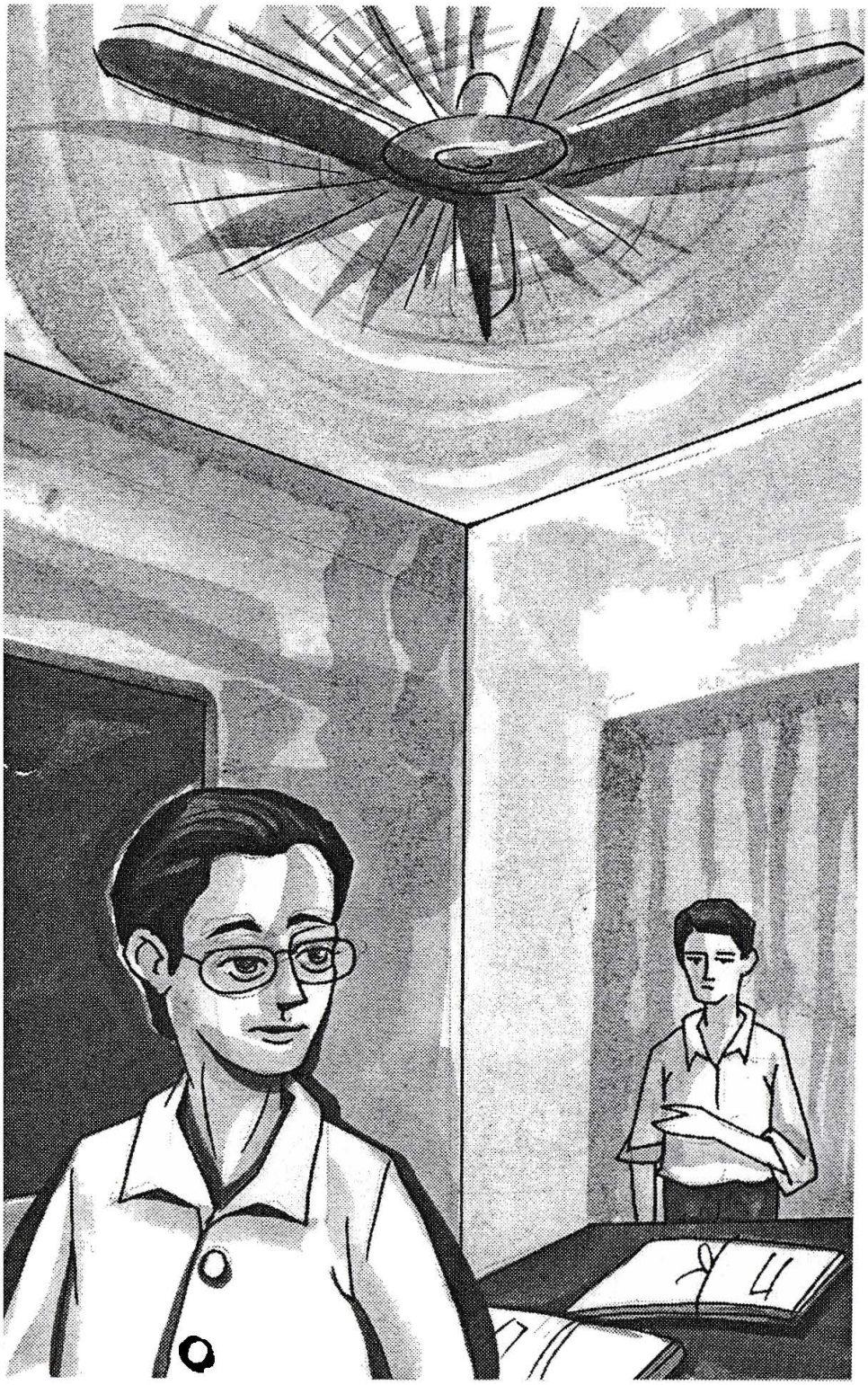

গোয়েন্দা মি. রাসেদ উঠে এলেন জানালার কাছে। অর্ধেক খোলা জানালার কপাট-দুটো পুরোপুরি খুলে দিতে দিতে ইন্সপেক্টর হারিসকে বললেন, স্যার, আজ ভীষণ গরম পড়েছে।

জুনিয়রের কথায় মি. হারিস কিছু না বলে শুধু মাথা ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকালেন। তার ভাবনাও কেটে গেছে। তাই মাথার উপরের জোড়া লাগানো হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে টেবিলের উপর ঠাঁই নিয়েছে।

জুনিয়র ফের বললেন, স্যার, ওই কেসটার কি কোনো সুরাহা করতে পেরেছেন?

এবার মুখ খুললেন মি. হারিস। তিনি জানতে চেয়ে বললেন, কোন কেসটা?

ওই যে লাইট হাউজের কেসটা। কাল যে গেলেন।

ও আচ্ছা, লাইট হাউজের কেসটা আমার কাছে কেমন ধোয়াটে মনে হচ্ছে। বাদীর মা বলছেন তার ছেলে মতিকে ডেকে নিয়ে গেছে একই ফ্ল্যাটের রফিক সাহেবের ছেলে রনি। রনি মতির ক্লাসমেট। ওদের মধ্যে খুবই ভাব। ওরা পরস্পরের ভালো বন্ধুও বটে।

স্যার, আমি এ পর্যন্ত যে ক'টা কেস ফেস করেছি তার অধিকাংশেরই ভিকটিম ওদের বন্ধুবান্ধব কিংবা রিলেটিভ কেউ। তাই ক্লোজ ফ্রেন্ড বলে কোনো কথা নেই।

হ্যাঁ, আমিও এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়েই এগোতে চাচ্ছি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, রনিও নিখোঁজ। মতির লাশ পাওয়া গেছে কিন্তু রনির কোনো হদিস মিলেনি। রনির বাবা আবার তার ছেলে নিখোঁজ হবার কথা বলে ডায়েরি করেছেন। ওদিকে রনিকে আসামী করে কেস করেছে মতির বাবা আফজাল সাহেব।

স্যার, আসলেই তো কেসটা ইন্টারেস্টিং এন্ড ডিফিকাল্ট। জুনিয়র বললেন।

তা তো বটেই। মি. হারিস বললেন। তবে আমি ভাবছি অন্য একটা কেসের ব্যাপারে।

আদার কেস স্যার? জুনিয়র জানতে চাইলেন।

হ্যাঁ, একটু আগে একটা ফোন এসেছিল। পুরোপুরি কথা বলতে পারিনি। লাইনটা কেটে গেল। ভদ্রলোক শুধু বলেছেন হোটেলে খুন।

তাই নাকি? বুঝতে পারছি না আজকাল খুনের ঘটনা বেশি ঘটছে। মানুষের মন থেকে দয়ামায়া একেবারে উবে গেছে স্যার। কথায় কথায় খুনখারাবি। সে যাক স্যার, আমি একটু বেরোবো। শান্তিনগরের কেসটার কোনো কুলকিনারা পাচ্ছি না। অবশ্য আজ একটা ক্লু পেয়েছি। খুনির শ্যালিকার স্টেটম্যান থেকে একটা পজেটিভ ভিউ ফাইল করেছি। দেখা যাক, কদ্দুর এগুনো যায়। স্যার এ কেসটার ব্যাপারে আমাকে কিন্তু হেল্প করতে হবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন করব না, দরকার হলে বলবেন।

জ্বি স্যার, অবশ্যই বলব। এখন আসি স্যার। আল্লাহ হাফেজ।

মি. রাসেদ বেরিয়ে গেলেন। ইন্সপেক্টর হারিস আবারো মনোযোগী হলেন দৈনিক পত্রিকা পড়ায়। পত্রিকা পড়তে পড়তে তার চোখ এক জায়গায় গিয়ে আটকে গেল। মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলেন খবরটি। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে ত্রিশ পয়েন্টে খবরের হেডলাইন লেখা–

পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে তিন কোটি টাকার কষ্টিপাথরের মূর্তি নিয়ে দুর্বৃত্তদের পলায়ন

খবর নিজস্ব সংবাদদাতা: পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোটি টাকার কষ্টিপাথরের মূর্তি চুরি হবার ঘটনা ঘটেছে চাঁদপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে। ঘটনার বিবরণীতে প্রকাশ, গতকাল গভীর রাতে একদল দুর্বৃত্ত শহরের জনৈক পুরনো জমিদার বাড়ির অভ্যন্তর থেকে দুটো কষ্টিপাথরের মূর্তি চুরি করে নদী পথে পালানোর সময় গোপন সূত্রে তা জানতে পেরে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। কিন্তু দুর্বৃত্তরা স্পিডবোট বদল করে পালিয়ে যায়। মূর্তি দুটো দুইটি কাঠের বাক্সে লুকানো ছিল। পুলিশ ধারণা করছে মূর্তি দুটোর দাম আনুমানিক তিন কোটি টাকা। পুলিশ এও ধারণা করছে দুর্বৃত্তরা ঢাকায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে পারে...

ইন্সপেক্টর হারিস খবরটি কয়েকবার পড়লেন। খবরটি তার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হল। তিনি পত্রিকাটি আলাদা করে টেবিলের ডানপাশের প্রথম ড্রয়ারে রেখে দিলেন। মনে মনে ভাবলেন, কেসটার ভেতর চমৎকার একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। তার খুব আগ্রহ এ জাতীয় একটা কেসের দায়িত্ব নেয়ার। ক্রিমিনাল কেস ডিল করতে আর ভালো লাগে না। যদিও সম্প্রতি ক্রিমিনাল কেসের পাশাপাশি দেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণ জাতীয় কেসগুলোর ব্যাপারেও তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ক্রিমিনাল কেসে একধরনের নিষ্ঠুরতা জড়িয়ে থাকে। খুনখারাবি জাতীয় ব্যাপার মানেই তো নিষ্ঠুরতায় আচ্ছন্ন ঘটনা। ব্যক্তিগতভাবে যা তিনি পছন্দ করেন না।

ইন্সপেক্টর হারিস টেবিলের দ্বিতীয় ড্রয়ার টেনে ড্রয়ার থেকে একটা চুইনগামের প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেট থেকে একটা চুইনগাম নিয়ে মুখে পুরলেন। টেনশনে থাকলে মুখে চুইনগাম পুরে দেওয়া তার নিত্যকার অভ্যাস। চুইনগাম চিবোতে চিবোতে ফের লাইট হাউজের ব্যাপারটি নিয়ে ভাবলেন। ক্যাসটা আসলেই খুব জটিল। আজকাল কিশোররা নানা ক্রাইমে জড়িয়ে পড়ছে! এটার কারণ কী? কিশোররা ক্রমশ স্বার্থপর হয়ে ওঠছে। বন্ধু বন্ধুকে খুন করছে। অথচ এ বয়সের বন্ধুত্ব থাকে বেশ মজবুত। বন্ধুর জন্য সেক্রিফাইস মাইন্ড থাকে এ বয়সটাতে বেশি। বাট ইদানিং ঘটনা ঘটছে ভিন্ন। তাকে নিশ্চয়ই কোনো মনোবিজ্ঞানীর কাছে যেতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হবে। গোয়েন্দাগিরি করতে হলে মনোবিজ্ঞানে পারঙ্গম থাকলে ভালো করা যাবে বলে তার বিশ্বাস। অবশ্য এ জন্যে সে মাঝেমধ্যে মনোবিজ্ঞানের বই পড়ে। কিন্তু ভালো করে বুঝার জন্য একজন মনোবিজ্ঞানীর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ঠিক তখনি টেবিলে বসে থাকা ফোনে রিং বেজে ওঠল। হারিস সাহেব রিসিভার হাতে নিয়ে কানের কাছে ধরলেন। একটু আগের সেই ফোন। সেই কণ্ঠ। ফোনের অপর প্রান্তের লোকটি তাকে জানালেন আজ ভোররাতে নবাবপুর রোডের হোটেল কিংস্টারে তৃতীয় তলার সাত নম্বর রুমের একজন বর্ডার খুন হয়েছেন।

আপনি কে বলছেন? ইন্সপেক্টর হারিস জানতে চাইলেন।

আমার পরিচয় আপনাকে বলা যাবে না।

আপনি কীভাবে খুনের ব্যাপারটি জানলেন? মি. হারিস ফের প্রশ্ন করলেন অপর প্রান্তের লোকটির কাছে।

আপনি আমার সাথে বৃথাই জেরা করে কালক্ষেপণ করছেন। দেরি করলে ইনভেস্টিগেশনের অনেক ক্লু মিস করবেন আপনি।

ওকে। আপনি যখন পরিচয় দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করছেন, কী আর করা। তবে আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ভাই? মি. হারিস বিনীত গলায় বললেন।

কী রকম? লোকটা জানতে চাইল।

আপনাকে আমি ফের নক করব। আমার ধারণা খুনটার ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?

তা পরে দেখা যাবে। প্রয়োজন হলে আমিই আপনাকে ফের ফোন করব। বাই

লোকটা অপরপ্রান্ত থেকে ফোনের লাইন কেটে দিল।

মি. হারিস কিছুটা অবাক ও বোকা বনে গেলেন। কারণ একজন জাদরেল গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরকে একটা সাধারণ লোক তোয়াক্কা না করে লাইন কেটে দিল। তিনি ফোনের দিকে কিছু সময় তাকিয়ে রইলেন অবাক দৃষ্টিতে। এরপর উঠে দাঁড়ালেন।

ওয়ারলেসে কার সাথে যেন কথা বললেন। জানালেন হোটেলে খুনের কথা। ওয়ারলেসে তিনি জানালেন ঘটনার পর্যবেক্ষণে এখনি বেরিয়ে পড়ছেন। তার ফোর্স দরকার।

ওভার বলে ওয়ারলেসটা কোমরের বেল্টে আটকে রাখলেন এবং পরে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা পিস্তল নিয়ে তাও কোমরের গ্লাপ্সে বন্দি করে বেরিয়ে গেলেন মুহূর্তের মধ্যে।

নিচে এসে মোটর সাইকেলে চড়ে বসলেন এবং সাই করে মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন নবাবপুর রোডের উদ্দেশে।

তাকে ফলো করে পুলিশের একটি দল তার সাপোর্ট হিসেবে এগিয়ে গেল।

মি. হারিস হোটেল কিংস্টারের সামনে তার মটর সাইকেলের ব্রেক কষতেই দেখতে পেলেন একটি পুলিশের ভ্যান দাঁড়ানো। তিনি বুঝতে পারলেন সুত্রাপুর থানার পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসেছেন।

মি. হারিস মোটর সাইকেলের স্টার্ট বন্ধ করে হোটেল কিংস্টারের সামনে রাখলেন। তাকে ফলো করে তার সাথে আসা পুলিশের পিকআপ ভ্যানটিও সেখানে দাঁড়াল।

মি. হারিস দ্রুত পা ফেলে হোটেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

কিংস্টারে ঢুকতেই মি. হারিসের চোখে পড়ল হোটেলের রিসিপসন রুম। রিসিপসন রুমে কেউ নেই। ফাঁকা।

বেটারা সব গেল কোথায়? মনে মনে বললেন মি. হারিস।

এসময় একটি ছেলে দোতলা থেকে নেমে এল। মি. হারিস ধারণা করলেন ছেলেটি হোটেলের বয় হবে। তবুও সিউর হবার জন্য ছেলেটির পরিচয় জানতে চাইলেন,

তুমি কি এই হোটেলে চাকরি করো?

জ্বি স্যার, আমি হোটেলবয়। ছেলেটি বলল।

সিভিল পোশাকে এলেও কোমরে রক্ষিত পিস্তল আর ওয়ারলেস দেখেই হোটেলবয় বুঝতে পারল মি. হারিস পুলিশের লোক। তাই সে কাচুমাচু হয়ে রিসিপসন রুমের একপাশে দাঁড়াল। মি. হারিস হোটেলবয়কে দেখে বুঝতে পারলেন ছেলেটি সরলগোছের। তার থেকে কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যেতে পারে।

তোমার নাম কী?

আবদুল বাতেন।

ভেরি গুড। খুব সুন্দর নাম। বাতেন, হোটেলের ম্যানেজার কোথায়?

উপরে স্যার, তিনতলায়। পুলিশ স্যারগ লগে কথা বলতাছে।

ঘটনা কখন ঘটেছে? মি. হারিস জানতে চাইলেন।

আইজ রাইতে।

কীভাবে ঘটল?

7

জানি না স্যার। তয় মনে অয় হের লগের লোকজনই মাইরা পালাইয়া গেছে।

কী করে বুঝলে তার সাথের লোক মেরে পালিয়েছে?

কইতে পারি না স্যার। আমাগ বলা নিষেধ আছে। উপরে ম্যানেজার স্যার আছেন। ম্যানেজার স্যারের লগে কথা কইবেন স্যার?

হ্যাঁ, ম্যানেজারের সাথে পরে কথা বলব। তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগছে। তোমার বাড়ি কোথায় বাতেন?

চাঁনপুর।

চাঁনপুর মানে চাঁদপুরে?

জ্বি স্যার।

এখানে কতদিন হয় আছো?

দুই মাস হইব স্যার।

তোমাদের ম্যানেজারের বাড়ি কোথায়?

শৈরতপুর।

ম্যানেজার এখানে কতদিন হয় চাকরি করছে?

জানি না স্যার। তয় তিনচাইর বছর অইব।

ও আচ্ছা।

উপরে যাইবেন স্যার?

হ্যাঁ। চলো–

আমার লগে লগে আইয়েন স্যার-

বাতেন সোজা দোতলার উদ্দেশে পা বাড়াল। ইন্সপেক্টর হারিসও পা রাখলেন বাতেনের পেছনে পেছনে।

তিনতলার সিঁড়ি থেকে করিডোর ধরে প্রায় বিশ ফুট এগিয়ে গেলে সাত নম্বর রুম। যার কারণে সিঁড়ির ধাপ শেষ করে সামনের দিকে তাকাতেই সুত্রাপুর থানার দারোগা জয়নালকে দেখতে পেলেন। তার সাথে রয়েছে তিনজন কন্সটেবল এবং সিভিলিয়ান একজন লোক। মি. হারিস বুঝতে পারলেন সিভিলিয়ান লোকটি হোটেলের ম্যানেজার।

দারোগা জয়নাল ইনভেসটিগেশনে এসেছেন। রুমের ইনভেসটিগেশনের কাজ আপাত শেষ করে রুম থেকে বাইরে বারান্দায়

এসে দাঁড়ালেন জয়নাল দারোগা ও তিন কন্সটেবল।

ইন্সপেক্টর হারিস সেখানে পৌঁছতেই জয়নাল দারোগা প্রথমে স্যালুট দিয়ে এগিয়ে এসে হ্যান্ডসেক করলেন। তিন কন্সটেবল মি. হারিসকে স্যালুট দিল। তারা ফের রুমের ভেতরে ঢুকলেন।

জয়নাল দারোগা মি. হারিসকে বললেন, স্যার, আমি আমার দিকটা দেখছি, আপনি আপনার মতো করে দেখতে পারেন?

ওকে, নো প্রভলেম...আপনার কাজ আপনি করে যান। বাট ডেডবডি?

পোস্টমর্টেমে পাঠিয়েছি। জয়নাল দারোগা জানালেন।

আপনাদের ইনভেস্টিগেশন কি শেষ?

জ্বি স্যার। আপনি বললে আপনাকে হেল্প করতে পারি স্যার।

আপাতত দরকার নেই। দরকার হলে আমি আপনাকে নক করব।

ওকে স্যার। তাহলে আমরা এখন নিচে যাচ্ছি? আপনি কি যাবেন?

আমি পরে আসছি। আপনারা যান।

দারোগা জয়নাল কন্সটেবলদের নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সাত নম্বর রুম থেকে। হোটেলের ম্যানেজারও জয়নাল দারোগার সাথে নিচে নামতে পা বাড়াল।

ইন্সপেক্টর হারিস তাকে বাধা দিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই এই হোটেলের ম্যানেজার?

জ্বি। ম্যানেজার কাচুমাচু হয়ে বলল।

আপনি একটু পরে নামেন। আপনার সাথে আমার কথা আছে। ইন্সপেক্টর হারিস বললেন।

জ্বি, আচ্ছা স্যার। ম্যানেজার বলল।

ইন্সপেক্টর হারিস দেখতে পেলেন রুমের মেঝে রক্তের কাঁচা ছাপ লেগে অচেনা মানচিত্র তৈরি হয়েছে। রুমের বা পাশে একটা ডাবল বেডের খাট। বেশ পুরনো। খাটের চার কোণায় চারটি স্ট্যান্ড। তাতে পুরনো একটা মশারি বাধা অবস্থায় ভাঁজ করে তুলে রাখা হয়েছে। বিছানায় একটা শাদা চাদর এলোমেলো ও রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে। আছে দুটো বালিশ। একটা বালিশের অনেকটা অংশ রক্তে লাল।

সামনের দিকের দক্ষিণ কোণার স্ট্যান্ডে হাতের লাল ছাপ। রুমের শাদা দেয়ালের কোথাও কোথাও রক্তের ছিটেফোটা রয়েছে। রুমের ডান পাশে এটাস্ট বাথরুম। পায়ে রক্তছাপ ফেলে বাথরুমে গিয়েছে কেউ।

এসব তথ্য নিয়ে যখন বেরিয়ে আসবেন ইন্সপেক্টর হারিস তখনি তার নজরে এল রুমের বা-পাশে কোণায়, যেখানে ড্রেসিং টেবিল রয়েছে সেখানে দুটো ছোট ভারি ক্রাফট বোর্ডের বাক্স পড়ে আছে। বাক্স দুটো দেখে ইন্সপেক্টর হারিসের সন্দেহ হল। তিনি এগিয়ে গিয়ে বাক্স দুটোর মুখ খুলে পরীক্ষা করলেন। বাক্স দুটো সম্পূর্ণ ফাঁকা।

মি. হারিস হোটেল ম্যানেজারকে বাক্স দুটোর কথা জিজ্ঞেস করলেন।

বাক্স দুটো কিসের?

জানি না স্যার।

বাক্স দুটো কি আগে থেকেই রুমে ছিল? নাকি লোকটা নিয়ে এসেছে?

জ্বি স্যার, লোকগুলোর সাথেই ছিল।

লোকগুলোর সাথে মানে, কতজন ছিল এ-রুমে?

দু'জন স্যার।

কিন্তু খুন হয়েছে তো একজন?

জ্বি স্যার। ঘটনার পর থেকেই আরেকজন পলাতক। ম্যানেজার জানাল।

ও– আচ্ছা। ওদের ক'টি বাক্স ছিল?

স্যার আমি খেয়াল করিনি। সম্ভবত দুটোই ছিল।

সম্ভবত বলছেন কেন, আপনি রুম ভাড়া দেয়ার সময় লোকগুলোর লাগেজ খেয়াল করবেন না? এটা তো আপনার দায়িত্ব। বাক্সে কী ছিল তা আপনার জানা দরকার ছিল।

বুঝতে পারিনি স্যার।

ইন্সপেক্টর হারিস ম্যানেজারকে প্রায় ধমক দিয়ে বলল, মিথ্যে কথা বলবেন না। আপনি সবই জানেন।

তিনি আবারো বাক্স দুটো নেড়েচেড়ে দেখলেন। তিনি ধারণা করলেন, হয়ত খুনি বাক্সের ভেতরের জিনিস নিয়ে গেছে। ইন্সপেক্টর হারিস ম্যানেজারকে বললেন, ঠিক আছে, নিচ থেকে দারোগা সাহেবকে ডাকেন।

ম্যানেজার প্রায় দৌড়ে নিচে নেমে গেল।

এই ফাঁকে ইন্সপেক্টর হারিস ভালো করে তৃতীয় বারের মতো বাক্স দুটো পরীক্ষা করলেন। তিনি ভাবলেন, বাক্সের ভেতর নিশ্চয়ই ভারি কিছু ছিল। যা খুনি লোকটা নিয়ে গেছে। কিন্তু বাক্স ছাড়া নেবে কেন? কীভাবেই-বা নেবে? বাক্সদুটো রেখে যাবার কারণই-বা কী? নাকি বাক্স দুটো আগে থেকেই রুমে ছিল। ম্যানেজার ব্যাটা নিজেকে বাঁচাতে নিজেদের বাক্স অন্যের বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছেনা তো?

ইন্সপেক্টর হারিস তার ভাবনা নিয়ে বেশিদূর এগোতে পারলেন না। কারণ নিচ থেকে জয়নাল দারোগা উপরে ওঠে এসেছেন। এসেই ইন্সপেক্টর হারিসকে বললেন, স্যার কি আমাকে ডেকেছেন?

হ্যাঁ। শোনেন ঘরের আলামত লিস্ট করেছেন?

জ্বি স্যার।

বাক্স দুটোর নাম এন্ট্রি করেছেন?

জ্বি।

গুড। এ জন্যেই ডেকেছিলাম। ঘরটা সিলগালা করে দিন।

জ্বি স্যার তা দেব।

তাছাড়া এখানে সার্বক্ষণিক ডিউটি পুলিশ থাকবে। আমি প্রয়োজনে আপনাকে নক করব।

ঠিক আছে স্যার।

এরপর ইন্সপেক্টর হারিস ও জয়নাল দারোগা নিচে নেমে এলেন। তার আগে একজন কন্সটেবল সাত নম্বর রুমটি সিলগালা করে দিল।

নিচে নেমে কিংস্টার হোটেলের অফিস রুমে বসলেন ইন্সপেক্টর হারিস ও জয়নাল দারোগা।

এ-সময় হোটেল বয় বাতেন কোক-বিস্কুট নিয়ে হাজির হল। কিন্তু ইন্সপেক্টর হারিস ও জয়নাল দারোগা এসবের কিছুই খেলেন না।

জয়নাল দারোগা চারজন কন্সটেবলের দুজন সাত নম্বর রুমের পাশে আর দুজকে নিচে ডিউটি ভাগ করে দিয়ে গাড়িতে ওঠলেন। ইন্সপেক্টর হারিস হোটেলের অফিস রুমেই বসে রইলেন। বসে রইলেন হোটেলবয় বাতেনের সাথে কথা বলার জন্য। কারণ তিনি মনে করছেন বাতেনের কাছে কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া তার কাছে খুনির পরিচয় জানার চেয়ে রুমের খালি বাক্স দুটো বেশি ইমপরটেন্ট। তিনি খালি বাক্স দুটোর ভেতরে একটা রহস্যের গন্ধ খুঁজে পেলেন। এমনকি অফিসে দৈনিক পত্রিকায় পড়া দুর্বৃত্তদের মূর্তি নিয়ে উধাও হবার ঘটনার সাথে সাত নম্বর রুমের খালি বাক্সের রহস্যজনক মিল খুঁজে পেলেন।

ইন্সপেক্টর হারিস ম্যানেজারের কাছ থেকে হোটেলের এটেন্ডেন্স খাতা দেখতে চাইলেন। হোটেল ম্যানেজার ইন্সপেক্টর হারিসকে টেবিলের ড্রয়ার খুলে খাতা দিলেন। খাতার পাতা উল্টাতে উল্টাতে ম্যানেজারের চোখে চোখ রাখলেন ইন্সপেক্টর হারিস। এরপর ম্যানেজারকে বললেন, ম্যানেজার সাহেব গতকাল ক'টা পর্যন্ত ডিউটি করেছেন?

স্যার আমি রোজ সন্ধ্যা হলেই চলে যাই।

কালও কী তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলেন?

জ্বি স্যার।

কিন্তু হোটেলের হাজিরা খাতায় দেখা যাচ্ছে আপনি রাত সাড়ে এগারটায় হোটেল ত্যাগ করেছেন?

এ কথায় ম্যানেজার থতমত খেয়ে গেল। কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, স্যার গরীব মানুষ একটু ওভারটাইম-এর আশায় টাইমের একটু হেরফের করি। আসলে স্যার আমি সন্ধ্যায়ই চলে গিয়েছিলাম।

আপনি তো ম্যানেজার নামের কলঙ্ক। আপনাকে এখানে চাকরি দিয়েছে কে? আপনাদের মতো দুর্নীতিবাজদের জন্যই বাংলাদেশ প্রতিবছর দুর্নীতিতে ফার্স্ট হয়।

স্যার, বেতন-টেতন খুব কম দেয় স্যার। এইসব টাইম-টেবিল এদিক-সেদিক কইরাই সংসার চালাইতে হয়।

ম্যানেজারের সাথে ইন্সপেক্টর হারিসের এই মুহূর্তে আর একটি কথাও বলতে ইচ্ছা হল না। সে বাতেনকে ডাকল। ডাক পেয়ে বাতেন দ্রুত এসে ইন্সপেকটরের সামনে দাঁড়াল।

বাতেন সামনে এসে দাড়াতেই ম্যানেজার বলল, স্যার ওকে আবার কীসের দরকার? ও তো হোটেলের সামান্য বয়।

হ্যাঁ, এ জন্যই ওকে দরকার। বাতেন আমি যা যা জিজ্ঞেস করি ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। শক্ত গলায় বলল ইন্সপেক্টর হারিস।

বাতেন ইন্সপেক্টর হারিসের কথার কোনো জবাব না দিয়ে অনুমতির জন্য তার ম্যানেজারের দিকে তাকাল।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল ইন্সপেক্টর হারিস। সেও ম্যানেজারের দিকে চোখ রাখল। ম্যানেজার পড়ে গেল বিপদে। বাতেন কী বলতে কী বলে ফেলে কে জানে! আবার ইন্সপেক্টর হারিসের সামনে কিছু বলতে বারণ করলেও মশকিল। এরকম উভয় সংকট নিয়ে সে বাতেনকে কায়দা করে অনুমতি দিল।

তুই তো কিছু দেখছই নাই, বলবি আর কী? যদি কিছু দেখে থাকস তাইলে বল।

বাতেন ম্যানেজারের চালাকি বুঝতে না পেরে বরং তার কথায় দ্বিমত পোষণ করল। সে বলল, না স্যার দেখছিতো।

কী দেখেছ? ইন্সপেক্টর জানতে চাইল।

কোথায় দেখলি? তুই তো তখন ওপরে ঘুমাইয়া আছিলি। ম্যানেজার বাতেনকে নিবৃত করতে চাইল।

না না আমিই তো বাক্সগুলান উপরে ওঠাইলাম। বাতেন বলল।

ম্যানেজার ঠোঁট কামড়াতে লাগল। আড়চোখে ম্যানেজারের স্ববিরোধী কথাবার্তাসহ সবকিছুই খেয়াল করছিল ইন্সপেক্টর। তবে সে ম্যানেজারকে কিছু বলল না। বলল বাতেনকে।

কয়টা বাক্স তুলেছিলে?

চাইরডা। দুইডা একটু ভারি বেশি আছিল। দুইডা আছিল ভারি কম। বাতেন বলল।

ওকে। ওরা কতজন লোক ছিল? ইন্সপেক্টর জানতে চাইলেন।

চাইর জন। দুইজন ছিল সাত নম্বর রুমে, দুই জন আট নম্বর রুমে। লোকগুলান খুব ভালা। আমারে একশ টেকা বখছিস দিছে।

আট নাম্বার রুমের লোকগুলো কোথায়?

হেরা পলাইছে। আমার মনে হয় স্যার বাকি তিনজনই মিল্লা একজনরে মারছে। মারনের আগে রুমের ভিতরে চিল্লাচিল্লি হুনছি।

তারপর? জানতে উদগ্রীব হল ইন্সপেক্টর।

এরপর আর জানি না স্যার। বাতেন বলল।

ওকে। ধন্যবাদ তোমাকে। এরপর ম্যানেজারকে বলল, ম্যানেজার সাহেব, আমি পরে আসব। আপনার সাথেও আমার কথা আছে। আরেকটি কথা, যদিও নিজেকে বোকা মানুষ হিসেবে বুঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন, আসলে আপনি বোকা নন। অতি চালাক এবং দুর্নীতিবাজ। চালাক ভালো, অতি চালাক ভালো নয়। দুর্নীতিবাজ তো পরিবারের দুশমন, সমাজের দুশমন, দেশের দুশমন। সে যাক, আমি আট নম্বর রুমটা দেখে চলে যাব। বাতেনকেও আমার প্রয়োজন হবে। ওকে আপাতত ছুটি দেবেন না। আপনিও ছুটিতে যাবেন না কিংবা পালাবার চেষ্টা করবেন না। ঠিক আছে?

জ্বি স্যার ঠিক আছে। ভয়ার্ত গলায় বলল ম্যানেজার।

চলুন, আমার সাথে আট নাম্বার রুমে যাবেন। বাতেন তুমিও চলো।

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর হারিস ওঠে দাঁড়ালেন। ওঠে দাঁড়াল ম্যানেজারও। তারা অফিস রুম ত্যাগ করলেন।

আট নাম্বার রুমটির বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। ম্যানেজার রুমের তালা খুলে দিল। ইন্সপেক্টর হারিস রুমে ঢুকলেন। রুমের ভেতরটা ভালো করে দেখলেন। প্রয়োজনীয় কিছু আলামত সংগ্রহ করলেন। ম্যানেজারকে বললেন, ম্যানেজার সাহেব, এ রুমের লোক দুটোও কি সাত নম্বর রুমের লোকদের সাথে একই সময়ে সিট নিয়েছে?

জ্বি স্যার।

ভাড়ার টাকা কি পরিশোধ করেছে?

জ্বি স্যার, ভাড়া দিয়ে রুমে ঢুকতে হয়। ম্যানেজার জানাল।

ভাড়ার টাকাটা কে দিয়েছে?

আট নাম্বার রুমের একজন স্যার।

রুম ভাড়া কত? ইন্সপেক্টর জানতে চাইলেন।

পাঁচশ টেকা স্যার। এটাস্ট বাথ তো স্যার এইজন্য পাঁচশ'র কম নিলে মালিকের নাকি পোশায় না। কমন বাথ তিনশ টেকা স্যার।

ওরা যখন পালাল তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

বাসায় স্যার। ওরা ভোর রাতে পালিয়েছে স্যার। হোটেলের বয়রা ঘুমে ছিল।

তাহলে কী করে পালাল? হোটেলের গেট কী বন্ধ ছিল না?

জ্বি স্যার বন্ধ ছিল। ওরা তালা ভেঙে বেরিয়ে গেছে স্যার। আমার কথা বিশ্বাস না করলে বাতেনকে জিজ্ঞেস করেন স্যার।

ম্যানেজারের কথায় সায় দিয়ে বাতেন বলল, জ্বি স্যার আমরা সবাই ঘুমাইয়া ছিলাম। তয় স্যার যহন রুমে ভিতরে চিল্লাচিল্লি হুনছিলাম তহন রুমে ঢুকলে হাতেনাতে খুনিরে ধরতে পারতাম। বাতেন গরগর করে বলল।

বাতেনের সরল উক্তিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হল না ইন্সপেক্টর হারিস চৌধুরীর।

ভাঙা তালাটা কোথায়?

নিচে অফিসে আছে স্যার। ম্যানেজার বলল।

ওকে ওটা আমাকে দেবেন। ইন্সপেক্টর হারিস বললেন।

ঠিক আছে স্যার।

এরপর ইন্সপেক্টর হারিস কথা না বাড়িয়ে নিচে নেমে এলেন। নিচে এসে দেখে গেটের তালা নেই। ম্যানেজার টেবিলের ড্রয়ারসহ অফিসরুম তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল। কোথাও সে তালা খুঁজে পেল না। না পেয়ে সে বাতেনকে বলল, বাতেন এই জায়গায় তো ভাঙা তালাটা রেখেছিলাম, তালাটা গেল কই? তুই কোথাও রেখেছিস নাকি?

আমি তো তালা দেখিই নাই। বাতেন বলল।

না দেখার কী আছে, আমার ড্রয়ারেই তো ছিল। এরপর ইন্সপেক্টর হারিসকে উদ্দেশ্য করে ম্যানেজার বলল, স্যার, আমি নিজ হাতে

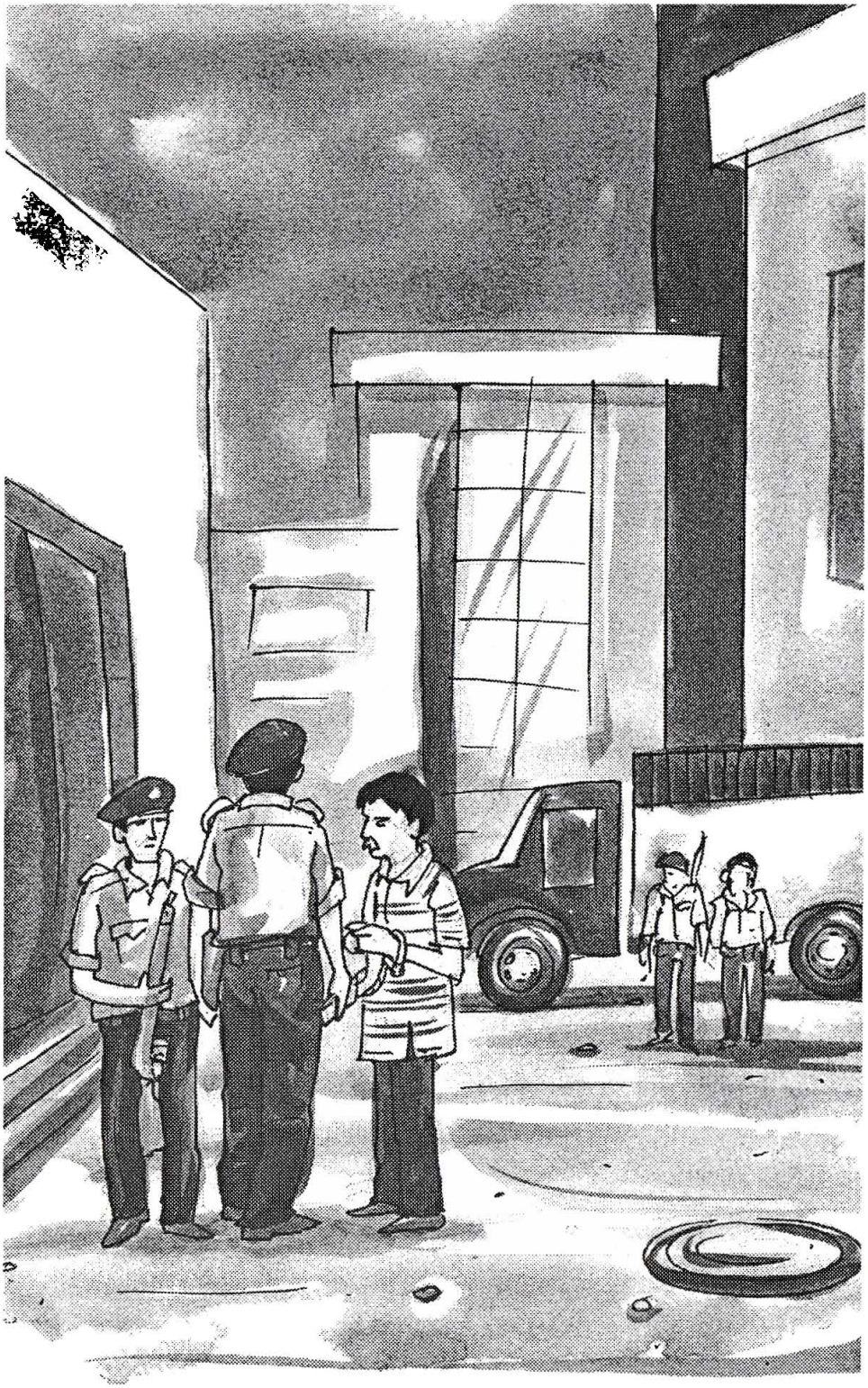

তালাটা ড্রয়ারে রেখেছিলাম; কিন্তু এখন পাচ্ছি না।

তালাটা রেখে কি ড্রয়ার তালা দিয়েছিলেন?

জ্বি না স্যার। এটা সবসময় খোলা থাকে। ম্যানেজার বলল।

ও তাই? আমি বুঝতে পেরেছি। তালার চাবিটা কোথায়?

আমার কাছে স্যার। ম্যানেজার পকেট হাতিয়ে বলল।

দিন চাবিটা আমাকে দিন।

ম্যানেজার চাবিটা ইন্সপেক্টর হারিসের হাতে দিল। ইন্সপেক্টর হারিস পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে সেখানে চাবিটা নিল এবং ম্যানেজার কিছু বুঝার আগেই কোমর থেকে হাতকড়া নিয়ে ম্যানেজারের হাতে পড়িয়ে দিল।

ব্যাটা ম্যানেজারের বাচ্চা, ভেবেছিস আমি কিছুই বুঝি না। তোকে এরেস্ট করা হল। থানায় নিয়ে তোর কাছ থেকে আসল কথা বের করতে হবে। সাতনম্বর রুমের খুনের ব্যাপারে তুই সব জানিস। ইন্সপেক্টর হারিস হোটেল ম্যানেজারকে হাতকড়া পড়িয়েই ওয়ারলেস ম্যাসেজে ফোর্স পাঠানোর জন্য বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফোর্স এসে হাজির হলে ইন্সপেক্টর হারিস ম্যানেজারকে তাদের হাতে তুলে দিল। ম্যানেজারের কোনো অনুরোধই ইন্সপেক্টর হারিসের মন গলাতে পারল না।

দয়া করে এড়িয়ে যাবেন না

বাংলাপিডিএফ এ আপলোডকৃত বইসমূহ আপনার নিজের ওয়েবসাইট/ব্লগ/সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করার সময় দয়া করে অরিজিনাল আপলোডারদের ক্রেডিট দিন। দিনে দিনে পিডিএফ বইয়ের সংখ্যা যে কমে আসছে তার অন্যতম প্রধাণ কারন অবাধে এক ওয়েবসাইটের বই অন্য ওয়েবসাইটে কোন প্রকার মেনশন করা ছাড়াই শেয়ার করা। এর মধ্যে কেউ কেউ তো আবার আরেকজনের আপলোড করা বই ওয়াটারমার্ক লাগিয়ে নিজের বলেও চালিয়ে দিচ্ছেন। এটা খুব দ্রুত বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাপিডিএফ থেকেও অনেক আপলোডার হারিয়ে গেছেন শুধুমাত্র এইসব পিডিএফ চুরির কারনে। অল্প গুটিকয়েক যেসব আপলোডার আছেন, তাদেরও অনেকে নিয়মিত পিডিএফ আপলোডে উৎসাহ পান না। কাজেই তাদের ধরে রাখার দায়িত্তটা আপনাদের পাঠকদের নিতে হবে। আমাদের বই শেয়ার করেন, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু দয়া করে ওয়েবসাইটের নাম উল্লেখ করে করুন। এতে আপনাদের ওয়েবসাইটের ভিজিটর কিন্তু কমে যাবে না, উলটো সবাই আপনাদের সততার প্রশংসাই করবে। পিডিএফ কমিউনিটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন না।

বাংলাপিডিএফ এ ডোনেট করতে চাইলে সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে পেপালের মাধ্যমে করতে পারবেন। আর বিকাশ নাম্বার প্রয়োজন হলে মেইল করুনঃ banglapdf@yahoo.com এই ঠিকানায়!

ধন্যবাদ সবাইকে।

Banglapdf.net

ওরা এখন উত্তরায়

উত্তরার একটি বাড়ির তৃতীয় তলার ডান দিকের ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে ওরা। দু'মাস হয় ওরা এখানে ওঠেছে। চাকরিজীবী পরিবার পরিচয়ে ওদের লিডার কালা কফিল ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেও এখন ওরা থাকছে তিনজন। কালা কফিল, কালু ও টুলু। বাস্তবে ওরা দুর্বৃত্ত ও পাচারকারি। মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসহ দেশের অর্থকরি সম্পদ বিদেশে পাচার করাই ওদের কাজ। ইতিপূর্বে এই গ্রুপটি একাধিকবার দেশের নানা স্থান থেকে মূল্যবান অনেক প্রত্নসম্পদ বিদেশে পাচার করেছে। সারা দেশে রয়েছে এদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। বিভিন্ন গ্রুপে এরা ভাগ হয়ে আছে। তবে রাজধানী ঢাকা হচ্ছে এদের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। এখান থেকে এরা সারাদেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

গতকাল চাঁদপুর থেকে চুরি যাওয়া মূল্যবান কষ্টিপাথরের কালো মূর্তি দুটো নদীপথে ঢাকায় এনেছে তাদেরই আরেকটি গ্রুপ। যার সাথে গত ভোররাতে হোটেল কিংস্টারে এক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল এবং খুনের মতো ঘটনা ঘটে গেছে।

ওরা যে লোকটাকে খুন করেছে, সে আরেক পাচারকারি গ্রুপের সদস্য। যে গ্রুপের কাজ হল ঢাকার বাইরে থেকে চোরাই মাল ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।

এসব মাল হাতে পাওয়া মাত্র টাকা পরিশোধ করতে হয়। আজও চাঁদপুর থেকে আসা দুটো কষ্টিপাথরের মূর্তি হাতে পেয়ে টাকা পরিশোধ করেছিল। কিন্তু সামান্য একটা ঘটনায় কী হতে কী হয়ে গেল! খুন করে হোটেল ম্যানেজারের সহযোগিতায় পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে।

চাঁদপুর, বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চল থেকে আসা চোরাই মালগুলো হোটেল কিংস্টারেই হাতবদল হয়। এসব কাজে হোটেল কর্তৃপক্ষকে হাত করতে না পারলে সমস্যা। তাই ম্যানেজারকে তারা বড় অংকের টাকার বিনিময়ে হাত করে ফেলেছে। গত দুবছর যাবত ভালো মতোই কাজ করে আসছিল তারা। কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আজ টুলু মাথা গরম করে দুর্ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলল।

দুর্ঘটনার পর ওরা পালিয়ে এসেছে একটা ট্যাক্সি ক্যাব ভাড়া করে। প্রথমে ওরা গুলশানের একটা বাড়িতে উঠেছিল। সে বাড়িটাও ওদের ভাড়া করা। তবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ওরা ওখানে ওঠে না। আজও উঠেছে অনেক দিন পরে। সেখানে সকাল দশটা পর্যন্ত অবস্থান করে এখন এসেছে এ বাড়িতে। যে কোনো অভিযান শেষে সরাসরি এ বাড়িতে আসে না ওরা। এতে ধরা পরার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ওদের ঘনঘন বাসা বদল করতে হয়। এছাড়া আজকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন।

ভাগ্যিস, হোটেল কিংস্টার থেকে নেমেই ক্যাবটা পেয়ে গিয়েছিল। নয়তো রক্ষে ছিল না। ভোরে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দুটো বাক্স নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। এমনিতেই পুলিশের চোখ ঘুরতে থাকে মাছির মতো। দিনদিন কাজ করা বড়ই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

এসব ভাবতে ভাবতে দুর্বৃত্তদের লিডার কালা কফিল তালা খুলে ঘরে ঢুকল। তার পেছনে পেছনে টুলু ও কালু। ওদের দুজনের হাতে দুটো বাক্স। বাক্স দুটো খাটের নিচে রেখে পাশের সোফায় এসে বসল সবাই। বসতে বসতে কালা কফিল বলল, কালু ফ্যানডা ছাড় তো।

কালু ওঠে সিলিংফ্যানের সুইচ অন করল।

ফ্যান প্রথমে ধীরে পরে দ্রুত ঘুরে তার সব বাতাস বিলিয়ে দিলো ওদেরকে। তবুও ওদের ঘর্মাক্ত শরীর ঠাণ্ডা করতে পারল না। কালা কফিল ফের কালুকে বলল, ওই ব্যাটা ফ্যানডা বাড়াইয়া দে না। এত কিপটা অইছস ক্যান?

কালু ওঠে ফ্যানের রেগুলেটরের কাছে এসে বলল, বস ফ্যান তো ফুল স্পিডেই ঘুরতাছে।

তাইলে গরম কমতাছে না ক্যান? কালা কফিল প্রশ্ন করল।

পেরেশানে আছেন তো তার জন্য গরম বেশি লাগতাছে। টুলু সহজ উত্তর দিয়ে দিল।

তুই ব্যাটা কথা কইস না। ভেজালডা তো তুই-ই বাজাইলি। কইলাম খুনখারাবির দরকার নাই। তুই হুনলি না। অরে পামপট্টি মাইরা এহানে আইনা সাইজ করলে এই পেরেশানে পড়তে অইত না।

আমার কী দোষ, অয়ই তো বেশি বাড়াবাড়ি করল। কইলাম মাল দুইডা সাপ্লাই দিয়া তোর বাকি টেকা দিয়া দিমু। তা না হুইনা কইল উল্টা কথা। "সাপ্লাইর খেতা পুড়েন। অনেক রিস্কে মাল দুইডা চাঁনপুর থন আনছি। পুলিশ যেইভাবে পিছু নিছিল, কাদের ভাই যদি ম্যানেজ না করত তাইলে মাল আর পাওন লাগত না।" আচ্ছা বস, আপনেই কন আমরা কহনো কারো লগে বেঈমানি করছি?

তা করি নাই। ওই ব্যাটা তো নতুন পার্টি। আমাগ ব্যাপারে আইডিয়া নাই। তয় তোরা একটা কাম ভুল করছস। কালা কফিল বলল।

কী বস? টুলু জানতে চাইল।

খালি বাক্স দুইডা হোটেলে রাইখা আহন ঠিক হয় নাই।

সমস্যা হইব না বস। এহন আর আমাগ পায় কে? ঘটনা ঘটাইছি নবাবপুরে। আমরা এহন আছি উত্তরায়। জানব কেডা আমরাই খুন কইরা আইছি? কালু বলল।

হোন, তোরা এহনও পোলাপান রইয়া গেছস। পুলিশ জাত এমন বদমাশ যে হালার পুতেরা কোন ফাঁকে যে আমাদের ফলো করব টেরও পাইবি না। আমরা যহন ক্যাবের থন নামলাম, তহন কি পিছনের দিকে তাকাইছিলি? আমাগ তো আবার কেউ ফলোটলো করে নাই?

না বস। গলির ভেতর শুধু আমাগ ট্যাক্সি ক্যাবই ঢুকছে। আমাগডা ছাড়া তো কোনো গাড়ি ঢুকতে দেখি নাই।

যাক, এহন আল্লার কাছে প্রার্থনা কর যাতে ঠিক মতো মাল দুইডা পার্টিগ কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারি।

বস মাল দুইডা হাত বদল হইব কোন হানে?

আরিচা ঘাটে। তয় যাইতে অইব উল্টারুটে। জয়দেবপুর হইয়া যামু। আশুলিয়া দিয়া যাওন ঠিক অইব না।

কালা কফিলের কথা শেষ হতে না হতেই তার মোবাইল বেজে ওঠে। আতকে উঠল সে। কে আবার ফোন করল! নাম্বারও অচেনা। কল রিসিভ করবে কী করবে না, এই ভেবে কয়েক সেকেন্ড কাটিয়ে দিল। এরপর কালুর হাতে মোবাইল দিয়ে কালা কফিল বলল, কালু ফোনডা ধর। দ্যাখ কোন হালারপুতে ফোন করছে।

কালু হাত বাড়িয়ে মোবাইল নেয় এবং ইয়েস বাটনে চাপ দিয়ে কল রিসিভ করে।

হ্যালো– কেডা? কাদের ভাই?

এরপর হাত দিয়ে মোবাইল ঢেকে রেখে কালা কফিলকে বলল, বস কাদের ভাই ফোন দিছে। আপনে কি এইহানে আছেন?

হ আছি, মোবাইলডা দে আমার কাছে।

হ বস আছে। নেন বসের লগে কথা কন। কালু তার বসের হাতে মোবাইল দেয়।

কালু বসের হাতে মোবাইল দেয়। কফিল কানের কাছে মোবাইল ধরেই বলে, কাদের কও কী কইবা।

কী কইবা মানে, তুমি জান না কী কইতে চাই? মোবাইলের অন্য প্রান্ত থেকে কাদের বলল।

শোনো মিয়া ঘটনাটা ঘটাইতে চাই নাই। ঘইটা গেছে। এই জন্য সরি কাদের। তোমার টাকা তুমি পাইয়া যাইবা। তুমি এইডা নিয়া বেশি বাড়াবাড়ি কইর না।

তুমি আমার লোকজন খুন কইরা কইবা বাড়াবাড়ি কইর না। এইডা কি মামুর বাড়ির আবদার পাইছ? বাড়াবাড়ি করুম না তো কি ছাইড়া দিমু? কাদের বলল।

সরি কইছি। এরপর তোমার বাড়াবাড়ি করা ঠিক অইব না। আর যদি বাড়াবাড়ি করই, তাইলে টেকা পাইবা না।

তুমি টেকা তো দিবাই, জানডাও হারাইবা। আমি তোমার শেষ দেইখা ছাড়ুম। কাদের ধমকের সুরে বলল।

অইছে মিয়া, পারলে তুমি কিছু কইর।

কল কেটে দিলো কালা কফিল। কেটে কালু ও টুলুকে উদ্দেশ্য করে বলল, কাদের হালারপুতে তো খুব ক্ষ্যাইপা গেছেরে। আসলেই খুনডা কইরা ভুলই করছি। কাদেইরা বহুত প্যাচগি আদমি। যাক, তোরা বিশ্রাম ল। বিশ্রাম শেষে যা করার করমু।

ঠিক আছে বস। কালু বলল।

সারা রাতের ধকল কাটাতে সবাই বিশ্রাম নিতে যার যার বিছানায় যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

তখন ফের কাদেরের ফোন এল কালা কফিলের মোবাইলে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল কারা কফিলের। সে ফোন রিসিভ করে বিরক্ত গলায় বলল, শোনো কাদের মিয়া, বেশি বকবক কইরাই তো মানুষ হারাইছ এইবার তোমার টেকাডা হারাইলা। আমি কফিল কইতাছি তোমারে টেকা দিমু না, তুমি যা পার কইর।

কালা কফিল ফোন কেটে দিল।

একই সূত্রে গাঁথা

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর হারিস তার অফিস কক্ষে বসে হোটেল কিংস্টারের খুনের কথা ভাবছিলেন। তিনি মনে মনে হিসাব মেলাচ্ছিলেন চারটি বাক্সের দুটো কোথায় গেল তা নিয়ে। তিনি ড্রয়ার থেকে আজকের দৈনিক পত্রিকাটি বের করে টেবিলের উপর রাখলেন এবং সকালের সেই খবরটিতে ফের চোখ বুলালেন। খবরটির সাথে হোটেল কিংস্টারের খুনের একটা মিল খুঁজে পেলেন। কিন্তু তিনি ভেবে পেলেন না চারটি বাক্সের মধ্যে দুটো খালি কেন? নাকি দুর্বৃত্তরা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে দুটো বাক্স খালি রেখেছে। কখনো ধাওয়া খেলে খালি বাক্স দুটো রেখে ভরা বাক্স নিয়ে সটকে পরার কায়দা? যে করেই হোক তাকে এই কেসটার একটা সুরাহা করতে হবে। ইতিমধ্যে তার বসের কাছ থেকে কেসটার ব্যাপারে অনুমতি নিয়েছে। এ-সময় ফোন বেজে ওঠল তার। ইন্সপেক্টর হারিস হাত বাড়িয়ে রিসিভার নিল। অপর প্রান্ত থেকে ফোনের লোকটি বলল, আপনি কি গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর হারিস সাহেব?

কে বলছেন?

আমাকে আপনি চিনবেন না ইন্সপেক্টর সাব। আমার নাম কাদের। গত রাইতে হোটেল কিংস্টারে যে খুনটা হইছে, সেইটার ব্যাপারে সকালে আমিই আপনেরে খবরটা দিছিলাম। হুনেন, আপনে চাইলে এই ব্যাপারে কিছু ইনফরমেশন দিয়া আপনারে হেল্প করতে পারি। ফোনের অন্য প্রান্ত থেকে কাদের বলল।

কাদেরের কথা শুনে ইন্সপেক্টর হারিসের চেহারায় সব পেয়েছির উচ্ছ্বলতা এসে ভর করল। তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কারণ মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির আবাস পাওয়া যাচ্ছে। তাই উৎসাহভরে ইন্সপেক্টর

হারিস কাদেরকে বললেন, ঠিক আছে আপনার সাথে কীভাবে কোথায় দেখা করতে পারি বলুন?

সরি, ইন্সপেক্টর সাব, আপনের লগে আমার দেখা অইব না। যদি জানতে চান তাইলে ফোনেই বলতে পারি?

ফোনে তো আর বিস্তারিত জানা যাবে না। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। কোনো প্রকার হয়রানি করা হবে না আপনাকে।

হুনেন ইন্সপেক্টর সাব, নিজেরেই চালাক ভাইবেন না। আমাদের মতো চোরাকারবারিদের থন আপনেরা কোনোদিনই বেশি চালাক না। আপনেরে ফোন করবার উদ্দেশ্য একটাই, আমি আমার শত্রুকে ধইরা দিবার চাই। কোনো প্রকার দেশপ্রেম, ভালোমানুষ সাজনের ইচ্ছা আমার নাই। আমি জাস্ট আমার শত্রুকে শাস্তি দিতে চাই। কারণ ও আমার লোককে হত্যা করছে। আমার সাথে গাদ্দারি করছে। এইজন্য অরে অনেক ব্যয় দিতে অইব। আমি অরে খুন করুম। প্রতিশোধ আমি নিমুই ইন্সপেক্টর।

আপনিই যদি প্রতিশোধ নেবেন তো আমাকে ফোন করেছেন কেন? ইন্সপেক্টর সহজ গলায় বললেন।

কফিল্লারে আমি দুইদিক থন এটাক্ট করুম। একদিকে পুলিশ আর অন্যদিকে আমি। যাতে অয় কোনোদিক থনই বাঁচতে না পারে। অরে বুঝাইতে চাই গাদ্দারি করার খেসারত কত ভয়। প্রতিশোধের গলায় বলল কাদের।

কফিল আপনার সাথে গাদ্দারি করেছে কেন? ইন্সপেক্টর জানতে চাইলেন।

এটা আমিও বুঝতে পারতাছি না। গত দুইবছর ধইরা আমরা একলগে ব্যবসা করতাছি। কিন্তু হঠাৎ করে কী হইল কে জানে? তবে আমার ধারণা, কষ্টি পাথরের মূর্তির দাম খুব বেশি বইলা অয় লোভ সামলাইতে পারে নাই।

এ কথা শোনার সাথে সাথে লাফিয়ে ওঠল ইন্সপেক্টর হারিস। তার ধারণাই ঠিক। পত্রিকার সংবাদের সাথে হুবহু মিলে গেছে হোটেল কিংস্টারের ঘটনা। তা আরো ক্লিয়ার করে দিল কাদের।

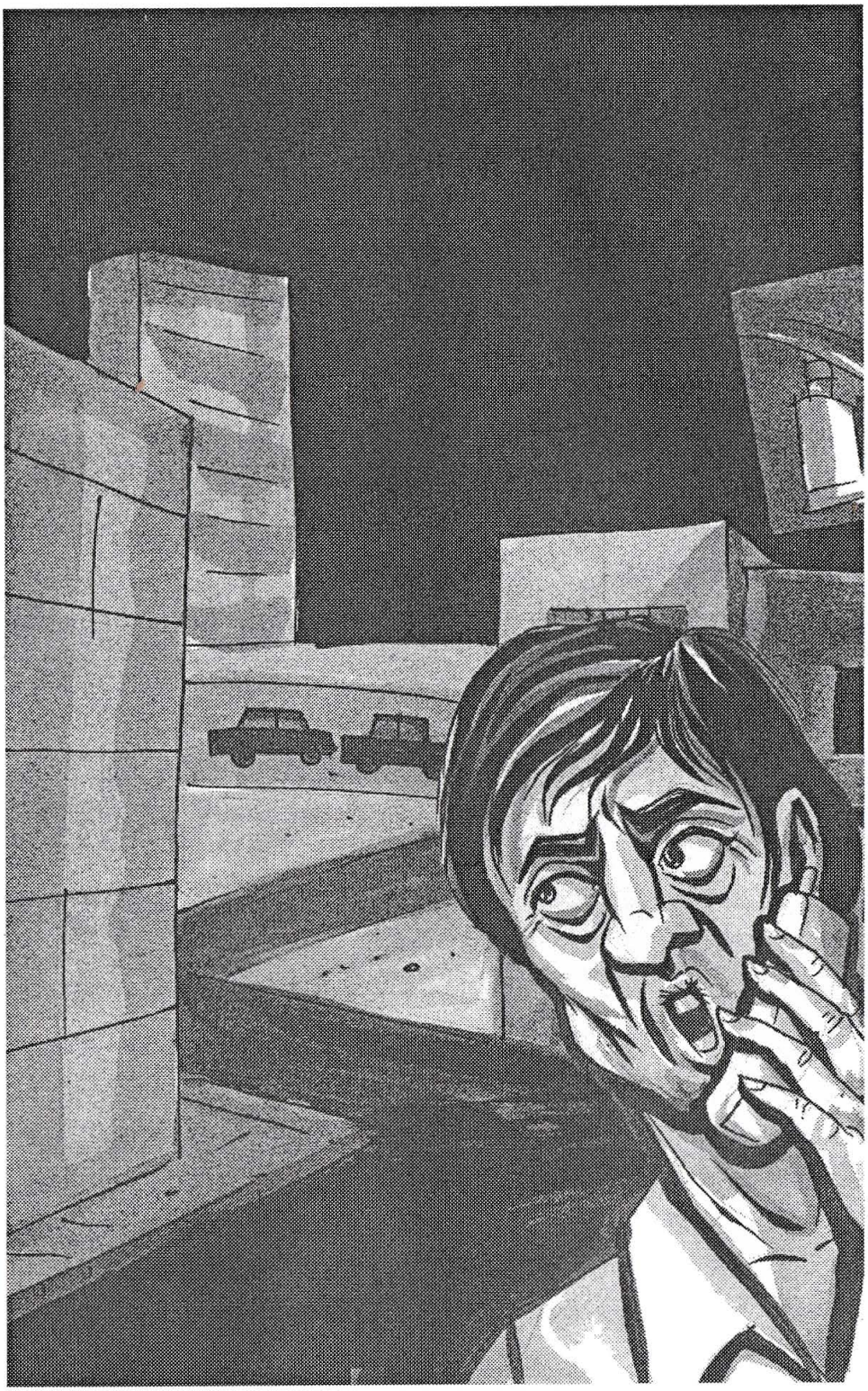

কাদের বলল, আজ বিভিন্ন পত্রিকায় চাঁদপুরে তিন কোটি টেকার মূর্তি চুরি হবার যে খবর পড়ছেন কালা কফিল আমার লোক হত্যা কইরা অই মূর্তি নিয়া গেছে । অথচ এ মূর্তি দুইডা চুরি করতে গত একবছর ধইরা চেষ্টা কইরা আইছি। গতরাইতেই কেবল সফল হইছিলাম। তাও হাতছাড়া অইয়া গেল। আপনেই কন ইন্সপেক্টর, এইডা কী ছাইড়া দেওন ঠিক অইব?

না কখনোই ঠিক নয়। আপনারা কতজন ছিলেন গতরাতের অভিযানে? পুলিশকে কীভাবে ফাঁকি দিলেন?

খুব মজা পাইতাছেন আমার কথা হুইনা, না? কাদের তিরস্কারের স্বরে বলল।

কিন্তু এতে ইন্সপেক্টর হারিস রাগ করলেন না। তার এখন রাগ করলে চলবে না। ইনফরমেশন পাওয়া হল কথা। কাদেরকে রাগালে বড়ো বেশি ভুল করবে সে। তাই সহজ ভঙিতে বলল, হ্যাঁ, কিছুটা তো মজা রয়েছেই। আপনি না বললে এতকিছু জানা আমি কেন, কোনো পুলিশের পক্ষেই সম্ভব হতো না। তো কাদের সাহেব, চাঁদপুর থেকে মূর্তি দুটো হোটেল কিংস্টার পর্যন্ত পৌঁছালেন কীভাবে?

সেই কথা হুনলে তো আপনেগ পুলিশ বিভাগের চালাকি আর বোকামি অনেকটাই ক্লিয়ার হইয়া যাইব।

প্লিজ তবুও বলুন কাদের সাহেব। ইন্সপেক্টর হারিস কাদেরকে অনুরোধ করল গতরাতের ঘটনা বলার জন্য। কিন্তু তাকে বোকা বানিয়ে অপর প্রান্ত থেকে ফোনের লাইন কেটে দিল কাদের। রিসিভার হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ইন্সপেক্টর হারিস।

ব্যাটা ব্লাকার লাইনটা কেটে দিল! স্বগতোক্তি করল সে।

এর পরের ঘটনা কীভাবে এগুবে কিংবা এরপর সে কী পদক্ষেপ নিতে পারে তা নিয়ে ভাবল কতক্ষণ। কোনো কুলকিনারা খুঁজে পেল না। তবে কাদের পুরো ঘটনা না বললেও গতরাতে হোটেল কিংস্টারের খুনের মোটিভ অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে তার কাছে।

ইন্সপেক্টর হারিস রিসিভার রেখে চুপ করে থাকলেন অনেকক্ষণ। এরপর কী ভেবে বেরিয়ে গেলেন অফিসরুম থেকে।

মূর্তি নিয়ে জায়গা বদল

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাসায় থাকা নিরাপদ মনে করল না কালা কফিল। পুলিশের ভয় না যতটা তারচে বেশি ভয় কাদেরকে নিয়ে। ওই ব্যাটা যদিও এ বাসা চিনে না। তবে সে যে উত্তরা বাসা ভাড়া নিয়েছে তা জানে। এই ইনফরমেশন যদি পুলিশকে দিয়ে দেয় তাহলে ধরা পর্রে যাবার ভয় নাইনটি নাইন পার্সেন্ট। মূর্তি চুরির খবরটি সাংবাদিকরা গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে। এতে পুলিশের তৎপরতা বেড়ে যাবে। সেই সাথে কিংস্টারে মার্ডার। তাই বাক্স দুটো কী রেখে যাবে না অন্য কোথাও সরিয়ে রাখবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে কালুকে ডাকল কালা কফিল।

কালু এসে তার বসকে বুদ্ধি দিল এ বাসায় না থাকার জন্য। এও বলল যে, মূর্তিগুলোও এ বাসায় রেখে যাওয়া ঠিক মনে করছে না সে। কেননা, এ বাসায় পরে আসার সুযোগ নাও ঘটতে পারে। তখন কোটি টাকার হিসাবটা নেমে যাবে একেবারে শূন্যের কোঠায়।

কালু বলল, তারচে বরং বস আমরা আজ রাইতেই মূর্তি দুইডা নিয়া অন্য কোনো জায়গায় কাইটা পড়ি। দু'একদিন গা ঢাকা দিয়া নর্থবেঙ্গলের পার্টির কাছে হ্যান্ডওভার কইরা দিমু।

তাতো দেবই কালু, আমি ভাবছি বাক্স দুইডা নিয়া বার হওন ঠিক অইব কিনা? বাসা না চিনলেও কাদেইরা তো উত্তরা চিনে। আমি বলতাছি কী বাক্স দুইডা রাইখাই গা ঢাকা দিয়া থাকি কয়েকদিন। কালা কফিল বলল।

পার্টিরে বুঝ দিবেন কেমনে বস? টুলু বলল।

তুইই তো ব্যাটা ভেজালটা বাড়াইলি। খুনখারাবি করতে গিয়া

ঝামেলা বাড়াইয়া দিছস। যত্তসব আজাইরা ক্যাচাল। বাক্স এহানেই থাক। তাড়াতাড়ি চল কাইট্টা পড়ি। কালা কফিল বলল।

না বস, দিনের বেলা বের অওন খুবই রিস্কি ব্যাপার। সন্ধ্যাতক এই বাসায় অপেক্ষা কইরা রাইতে মাল দুইডা লইয়া একবারে বাইর হই। কালু বলল।

কালুর কথায় লিডার কালা কফিল একটু ভাবল। এরপর বলল, ঠিক আছে তোরা যা ভালা মনে করস। কিন্তু টুলু সন্ধ্যা পর্যন্ত তোর ডিউটি অইল জানলার কাছে বইসা নিচে চোখ রাখবি। কাউকে সন্দেহ অইলেই আমাকে জানাইবি। অবশ্য কাদেইরা তো আর বাসা চিনে না, ভয়টা অইল গোয়েন্দা হালারপুতেগ লইয়া। ক্যামনে যে খবর পাইয়া যায় বলা মশকিল। যাউকগা, আমি কী কইছি বুঝছস তো?

হ বস বুঝছি। টুলু কফিলকে ভরসা দেয়।

কালা কফিল টুলুর কথায় আশ্বস্ত হয়ে কালুকে বলল, এই কালু তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না চড়াইয়া দে। খুব ক্ষুধা লাগছেরে। রানতে পারবি তো?

হ বস, পারুম না আবার, কইয়াই দেহেন কী খাইবেন? আত্মবিশ্বাসের সাথে কালু বলল।

ঠিক আছে, দেখুম নে। কালা কফিল বলল।

কালু রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ায়। কালা কফিল খাটের উপর শরীর ছেড়ে দেয়।

টুলুর ডিউটি যেহেতু জানালার কাছে বসে নিচে খেয়াল রাখা, তাই সে জানালার কাছে গিয়ে বসল। বসে দৃষ্টি ফেলল নিচে রাস্তার দিকে।

রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে কালা কফিল, কালু ও টুলু ঘরের লাইট নিভিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেল। যাবার আগে ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দিল কালু। টুলুর হাতে দুটো বাক্স। বাক্স দুটোতে কষ্টিপাথরের মূর্তি। মূর্তি দুটোকে আজ রাতের মধ্যেই নর্থবেঙ্গলের পার্টির কাছে হস্তান্তর করতে হবে। পার্টিও তাই বলেছে। পত্রিকায় নিউজ হলে পার্টিরা আশঙ্কায় থাকে। কারণ এসব চোরাচালানির কারবারে কেঁচো

তুলতে সাপ ওঠে আসে কি-না। এছাড়া এ মূর্তিগুলোর জন্য পার্টি থেকে এডভান্স নেয়া হয়েছে। হাতে না পাওয়া পর্যন্ত পার্টির আশঙ্কা কমবে না। এডভান্স না নিলে পার্টির আশঙ্কা থাকেনা বললেই চলে।

ভালোয় ভালোয় পার্টির কাছে মাল দুইডা হ্যান্ডওভার করতে পারলেই বাইচা যাই, কী কস তোরা?

জ্বি বস। কালু বলল।

বাক্স দুটো নিয়ে সিঁড়িতে পা রাখল টুলু।

ঘরের তালা লেগেছে কিনা সময় নিয়ে দেখল কালা কফিল। বলল, এই কালু তালা ঠিক মতো লাগাইছস তো? টুলুকে বলল, টুলু একটা বাক্স কালুর হাতে দেসনা ক্যান।

টুলু সিঁড়ির দুই ধাপ মাত্র নেমেছে। বসের অর্ডার পেয়ে একটা বাক্স কালুর হাতে দিল। কালুও হাত বাড়িয়ে একটা বাক্স নিল ।

এরপর ওরা তিনজন সতর্ক দৃষ্টি ফেলে তিন তলার সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামল। নেমে গেট পর্যন্ত এল। দাড়োয়ান গেট খুলে দিতে দিতে বলল, স্যার, রাইতের বেলা বাক্স-বুক্স লইয়া কই যাইতাছেন?

এরকম টেনশনের সময় বাইরের মানুষের কথাবার্তা এমনিতেই ভালো লাগে না কালা কফিলের। তার ওপর দাড়োয়ান ব্যাটা একটা স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে। যার সহজ উত্তর দেয়া সম্ভব নয় কখনো।

এ কারণে, দাড়োয়ানের প্রশ্ন ভালো লাগল না কালা কফিলের। তার ভালো না লাগা সেয়ার করল কালু ও টুলুর দিকে তাকিয়ে। কালু সহজেই বসের মেজাজ বুঝতে পারে। সে বুঝতে পারল এখুনি দাড়োয়ানকে একটা ধমক দেয়া উচিত।

কালু দাড়োয়ানকে কষে এক ধমক লাগাল।

এই ব্যাটা তোর কাছে কইতে অইব কই যাই না যাই। তোর কাম অইল বাসাটা দেইখা রাখা। বাসাটা দেইখা রাখিস। আমরা ঢাকার বাইরে যাইতাছি।

ধমক খেয়ে দাড়োয়ান ভয় পেয়ে গেল। এমনিতেই তিনতলার ফ্ল্যাটের এই তিনজন লোককে খুব ভয় পায় সে। কেমন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর

চেহারা। নিরস-মেজাজি কথাবার্তা। সে দাড়োয়ান বইলা তুচ্ছ-তাচ্ছিল কইরা কথা কয়।

ধমক খেয়ে দাড়োয়ান দ্বিতীয়বার কিছু বলতে সাহস পেল না।

তবে ওরা তিন জন বেরিয়ে যাওয়ার পর তার মেজাজ দেখাল লোহার গেটের উপর। আওয়াজ করে লোহার গেটটা বন্ধ করল। তা বুঝতে পারল দুর্বৃত্তদের সকলেই। তবুও কিছু বলল না। এমনিতেই মাথায় বড় রকমের একটা ঝামেলা ঝুলে আছে। তার সাথে নতুন কোনো ঝামেলা যোগ না করাই ভালো। অন্য সময় হলে কালু গিয়ে কষে একটা চড় বসিয়ে দিত দাড়োয়ানের গালে।

যাক, ওরা তিন জন বাড়ির গেট থেকে কয়েক গজ দূরে এসে অপেক্ষায় রইল ট্যাক্সি ক্যাবের জন্য। তাদেরকে চোখ মেরে দু'একটা প্রাইভেট কার আসা-যাওয়া করলেও কোনো ট্যাক্সি ক্যাব গলিতে ঢুকতে দেখল না। আসলে এই এলাকার লোকদের ট্যাক্সি ক্যাবের খুব একটা দরকার হয় না। অধিকাংশেরই প্রাইভেট কার রয়েছে। যাদের নেই তারা সকলেই যে ট্যাক্সি ক্যাবে চড়বে এমন কোনো কথা নেই। তার উপর রাত বাজে দশটা। মেইন রোডে গেলে অবশ্য ক্যাব পাওয়া যাবে। কিন্তু মেইন রোডে যাওয়া খুব রিস্কি। কাদের আর গোয়েন্দার ভয়। কাদের খুব জেদি। তার এক লোকের খুনের বদলা নিতে সে তিনটা খুন করতেও দ্বিধা করবে না।

কালা কফিলকে একটু অস্থির মনে হল। টুলু আর কালু ব্যাপারটা ধরতে পারলেও কিছু বলল না। তারাও বসের সাথে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ক্যাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। একসময় টুলু বলল, বস এখানে বোধহয় ক্যাব পাওয়া যাইব না। চলেন ধীরে ধীরে মেইন রোডের দিকে যাই।

টুলুর কথায় কালা কফিলের মেজাজ খারাপ হলেও তার প্রকাশ ঘটাল না। তবে টুলুকে বলল, ঠিক আছে সবাইর যাওনের দরকার নাই। বাক্সডা কালুর হাতে দিয়া তুই মেইন রোড থাইকা একটা ক্যাব নিয়া আয়। ধরা পড়লে তুই পড়। ভেজাল তো হালার পো তুইই পাকাইছস। মাথা গরম কইরা ফুটা করছস, এহন দৌড়ের ওপর থাওন লাগে আমারও।

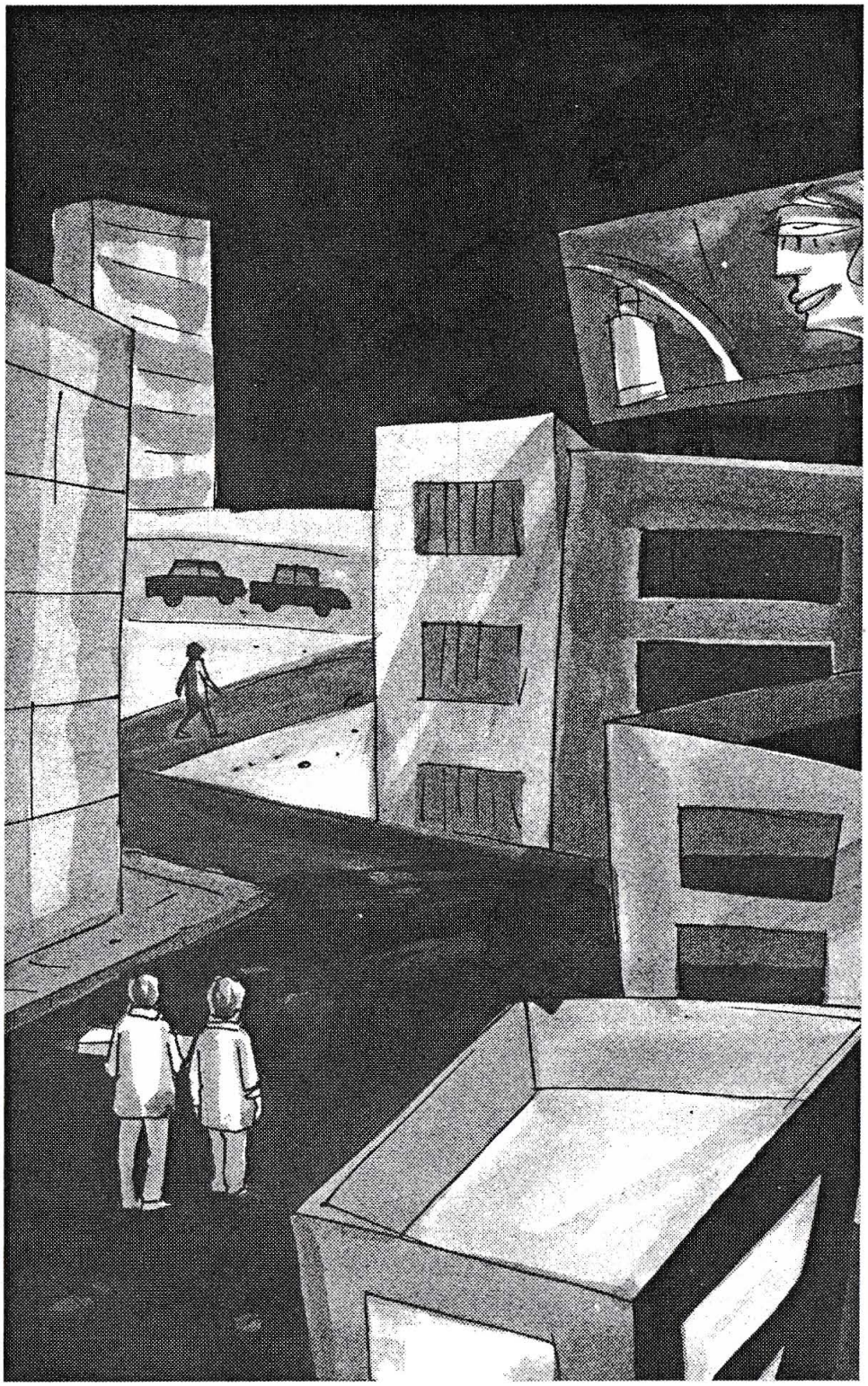

এই মুহূর্তে বসের কথার দ্বিরুক্তি করার সাহস নাই টুলুর। সে তার হাতের বাক্সটা কালুর হাতে দিয়ে মেইন রোডের দিকে পা বাড়াল।

কালা কফিল আর কালু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তা মেইন রোড থেকে অনেকটাই ভেতরে। দুটো বাঁক ঘুরে মেইন রোডে যেতে হয়। তাই কিছুদূর গিয়ে প্রথম বাঁক বাদিকে ঘুরতেই কালুদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল টুলু। একটু পর কালা কফিল কালুকে বলল, কালু কামডা বোধহয় ভুলই করলাম। টুলুরে তো কাদেইরা চিনে। তোরে পাঠানোর দরকার আছিল। তোকে তো আর কাদেইরা দেখে নাই।

আল্লাহ ভরসা বস। রাইতের বেলা সহজে চিনবার পারব না। কালু তার বসকে ভরসা দিল।

কী জানি আমার বেশি ভালা ঠেকতাছে না। এই প্রথম আমি খুব দুর্বল হইয়া গেছিরে কালু। তুই আমার দলে জয়েন করার আগে এরচে' বড় বড় কাম করছি, কিন্তু এত ভয় পাই নাই কিংবা দুর্বলও হই নাই কহনো। এইবার কিসের জন্য যে এমন লাগতাছে কে জানে! না জানি ধরা পইরা যাই?

বস আপনে শুধু শুধু ভয় পাইতাছেন। পুলিশ যদি টের পাইত, তাইলে অনেক আগেই ধইরা ফালাইত। সারাদিন বিশ্রাম নিতে পারতাম না। পুলিশ কন আর কাদেরের কথা কন, কেউই টের পায় নাই। কালু বসকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল।

কালু, তুই কাদেইরারে চিনস না। ওই হালায় কত বড় হারামি এইডা আমি জানি। কাদেইরা যদি একবার উল্টা গোত্তা মারে, তাইলে অরে কেউ ধইরা রাখতে পারব না। অর যেদিকে মন চায় যাইবই। উল্টাপাল্টা দেখলে অর নিজের লোকরেই ছাড়ে না, আর আমি ত অর একটা পার্টি মাত্র।

বস হঠাৎ শংঙ্কিত হয়ে পড়ায় কালুও কিছুটা ভরকে যায়। তবুও বসকে বারবারই সান্ত্বনা দিতে কিংবা তার ভাবনা থেকে শঙ্কা দূর করতে একটু কাছে এগিয়ে এসে একটা যাত্রীসহ ট্যাক্সি ক্যাব দেখিয়ে বলল, বস ওই যে দেহেন ক্যাব আইতাছে। মনে হইতাছে টুলু ক্যাব পাইয়া গেছে।

অইটার মধ্যে ত যাত্রী দেহা যাইতাছে? বকের মতো মাথা উঁচু করে কালা কফিল বলল।

কাছে আইলে বুঝন যাইব। নাকি টুলুই ক্যাব নিয়া আইল? কালুও মাথা উঁচু করে ক্যাবের ভেতরের লোকটাকে চেনার চেষ্টা করে।

যাত্রীসমেত ক্যাবটা তাদের পাত্তা না দিয়ে সাই করে চলে গেল। তাদের এই বিরক্তিকর অপেক্ষা কখন শেষ হবে কে জানে?

না, তাদের আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। নিরাপদেই একটা ক্যাব নিয়ে চলে এলো টুলু। ক্যাবটা তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ির ভেতর থেকে মাথা বের করে টুলু তার বসকে গাড়িতে ওঠার জন্য আহবান জানাল।

বস, তাড়াতাড়ি ওঠেন।

তড়িগড়ি করে কালা কফিল আর কালু ক্যাবে চড়ে বসল। ড্রাইভারকে বলে বাক্স দুটো রাখল গাড়ির পেছনে।

গাড়িতে ওঠেই কালা কফিল টুলুকে জিজ্ঞেস করল, ড্রাইভাররে কইছস কই যামু?

হ গাজিপুরের দিকে যামু কইছি।

ঠিক আছে দেখিস চারপাশে জ্যাম আছে কিনা।

বসের ইঙ্গিতপূর্ণ কথা কালু ও টুলু বুঝতে পারলেও ড্রাইভার বুঝতে পারল না। সে পেছনে মাথা ঘুরিয়ে বলল, জ্যাম দেখতে হইব না, এত রাইতে এই রোডে জ্যাম আসব কইথন?

ড্রাইভারের কথা কালা কফিলের পছন্দ না হলেও কোনো জবাব দিল না। কারণ, সে কী বুঝাতে চেয়েছে এটা কালু ও টুলু ঠিকই বুঝতে পেরেছে। ওই ব্যাটা ড্রাইভারের না বুঝলেও চলবে।

হলুদ ট্যাক্সি ক্যাব কালা কফিল, টুলু ও কালুকে নিয়ে উত্তরার অভিজাত এলাকা ত্যাগ করল।

মেইন রোডে বেরিয়েই ট্যাক্সি ক্যাব দৌড় দিল গাজিপুরের দিকে।

গাজিপুর এ্যাকশন

রাত সাড়ে দশটা। গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মি. হারিস বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে গতরাতের খুন এবং পরবর্তীতে জনৈক কাদের নামের স্বঘোষিত পাচারকারীর কথা ভাবছিলেন। একটু আগেও কাদের ফোন করেছিল। এবার সে অকপটে গতরাতে কীভাবে মূর্তি চুরি করে ঢাকায় নিয়ে এসেছে তা বলেছে। ইন্সপেক্টর হারিস অবাক ও বিস্মিত হয়েছে পাচারকারীদের বুদ্ধিমত্তা দেখে। সেই সাথে অবাক হয়েছে তাদের পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে কীভাবে রুট পরিবর্তন করে তা ভেবে। যদিও কাদেরের কথার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের আপাতত কোনো সুযোগ নেই।

কাদের বলেছে, যারা মূর্তি দুটো চুরি করেছে তাদের দায়িত্ব শুধু চুরি করে দ্বিতীয় গ্রুপের কাছে পৌঁছে দেয়া। দ্বিতীয় গ্রুপের দায়িত্ব মূর্তি দুটো মেঘনা বক্ষে তৃতীয় আরেকটি গ্রুপের কাছে পৌঁছে দেয়া পর্যন্ত। তৃতীয় গ্রুপটি মূর্তি দুটো স্পীডবোট পরিবর্তন করে একলাসপুর- মোহনপুর- সটাকি-ষাটনল এবং সর্বশেষ মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত গ্রুপ পরিবর্তন করে পাগলা এসে রাজধানী গ্রুপের কাছে ফাইনাল হস্তান্তর করেছে। পাগলা পর্যন্ত আসতে যে-কটি গ্রুপ কাজ করে তাদেরকে কন্ট্রাক দিয়ে দেয়া হয়। চুরি থেকে শুরু করে পাগলা পর্যন্ত আসতে সব গ্রুপ মিলিয়ে খরচ হয়েছে সাড়ে বারো লক্ষ টাকা। এ টাকাটা পরিশোধ করে থাকে কাদের। বিভিন্ন মাধ্যমে এবং হাত ঘুরে এ টাকা এডভান্সড করতে হয়েছে।

গতরাতে পাগলা থেকে কাদেরের গ্রুপ ক্যাবে করে বাক্স দুটো হোটেল কিংস্টারে নিয়ে এসেছে। কিংস্টারে ওঠার আগে আরো দুটো খালি বাক্স সংগ্রহ করা হয়েছিল, কারণ পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেয়ার

জন্য মাঝে মধ্যে এসব করতে হয়। এই গ্রুপের সদস্য সংখ্যা কাদেরসহ চারজন হলেও হোটেলে ওঠেছে মাত্র একজন। বাকি তিনজনের দুজন পাশের আরেকটি হোটেলে এবং কাদের ছিল সকলের অলক্ষ্যে।

চাঁদপুর থেকে আসতে পথে যার যার দায়িত্ব সে সে সামাল দেবে। পুলিশি ঝামেলাসহ যাবতীয় ঝামেলা তারাই দেখবে। কন্ট্রাক দেয়ার এই এক সুবিধা। কন্ট্রাক না দিলে পুলিশি ঝামেলাসহ অনেকরকম ঝামেলা পোহাতে হয়। যদিও নদী পথের কোনো গ্রুপই কাদেরকে ফেস টু ফেস দেখেনি এবং চেনেও না। সে পারতপক্ষে নিজের গ্রুপের বিশ্বস্ত দু'একজন ছাড়া সবার কাছে ফেস হয় না। তবে ঢাকার পুলিশি ঝামেলার ব্যাপারটা কাদেরকে একাই সামাল দিতে হয়। কখনো কোনো ঝামেলা বেধে গেলে মাঝেমধ্যে দু'একজন পরিচিত নেতাকে গিয়ে ধরতে হয়। বর্তমানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে নেতাদের দুর্দিন যাচ্ছে। তাই কাজকর্ম করতে হয় খুব সাবধানে। হিসাব করে। এখন ধরা পরলে জামিন নাই।

গতকাল হোটেল কিংস্টারে যে খুন হয়েছে তার নাম মানিক। মানিক ছিল কাদেরের বিশ্বস্ত অনুচরদের একজন। কালা কফিলের সাথে হোটেল কিংস্টারে টাকা লেনদেন হবার কথা ছিল। কিন্তু টাকার অংক ও শোধ করা নিয়ে মানিকের সাথে কালা কফিলদের কথা কাটাকাটি হয়। মানিক ফোনে ঝামেলার কথা কাদেরকে জানায়। কাদের ফোনে কালা কফিলকে পুরো টাকা দিয়ে দিতে চাপ দেয়। কালা কফিল পুরো টাকা দিয়ে দেবে বলে স্বিকার করে। তবুও কেন মানিক খুন হল এই নিয়ে সে সন্দিহান।

কাদেরের কাছ থেকে এসব কাহিনী শোনার পর কিংস্টারে খুনের আগে ও পরের ঘটনা বেশ কয়েকবার মনে মনে পুনরাবৃত্তি করে কোথাও ফাঁক আছে কিনা তা খোঁজার চেষ্টা করল। কারণ চোরাকারবারীদের সব কথা বিশ্বাস করা বোকামী। চোরাকারবারীরা কখনো নিজের ঘটনাটা সত্য বলে না। ঘটনায় রং মেখে বলে। নিজের স্বার্থটা বড় করে দেখে। তাই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য প্রতিপক্ষের জানা গোপন তথ্য সব বলে দেয়। এমনও দেখা গেছে

প্রতিপক্ষকে ফাঁসিয়ে দেয়ার জন্য নিজ দলের সদস্যদের মেরে ফেলে। তাই কাদেরের মতো লোকদের কথা কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা বুঝা মশকিল।

তবুও ইন্সপেক্টর হারিস মনে মনে সার্চ করে পুরো কাহিনী থেকে সত্য ঘটনা খুঁজে। বের করতে গিয়ে তার মনে কিছু প্রশ্ন উঁকি মারে–

এক. *কোনো চোরাকারবারী অকপটে অভিযানের কথা এভাবে ফোনে বলতে চায় না। কাদের কেন বলল?*

দুই. *কাদের নিজের নাম সহজেই বলে দেয়ার কারণ কি?*

তিন. *কালা কফিলের মতো লোকের কাছে শুধুমাত্র মানিককে কেন একা পাঠাবে?*

চার. *কালা কফিলের কাছে মূর্তি দুটো কত টাকার বিনিময়ে হস্তান্তর করা হয়েছিল?*

পাঁচ. *মূর্তি দুটো একটা বাক্সে না নিয়ে দুটো বাক্সে কেন নেয়া হয়েছিল?*

ছয়. *সাথে আরো দুটো খালি বাক্স কেন রাখা হয়েছিল?*

সাত. *খুন কিংবা মূর্তি পাচারের সাথে হোটেল ম্যানেজারের কোনো ভূমিকা আছে কিনা?*

আট. *পুলিশের তালিকায় চোরাকারবারী হিসেবে কাদের নামে কোনো নাম নেই। তাহলে কাদেরের আসল নাম কি? কিংবা কাদের আসল নাম হলে ছদ্ম নাম আছে কিনা?*

নয়. *কালা কফিল হঠাৎ করে কেন দ্বন্দ্বে জড়াতে গেল?*

দশ. *খুনটা কি পূর্ব পরিকল্পিত নাকি হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা?*

এগার. *কালা কফিল মূর্তি দুটো কোন পথে রাজধানী থেকে বের করতে পারে?*

এছাড়া আরো কিছু প্রশ্ন তার মনের মাঝে উঁকি মারলেও আপাতত এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করার অভিপ্রায়ে কাদেরের নম্বরে ফোন করল। কিন্তু কাদের যে নাম্বার থেকে পরপর দু'বার ফোন করেছে, সে নাম্বার এখন বন্ধ আছে। হতে পারে ফোনটা তার নয়। তাহলে কার? এখন এ তথ্য না পেলেও এটা বের করা যাবে। তবে কাদের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়ায় তার ইনফরমেশন আরো রহস্যাবৃত মনে হল ইন্সপেক্টর হারিস চৌধুরির কাছে।

কাদেরকে খুঁজে পাওয়ার কোনো সূত্র এই মুহূর্তে তার কাছে নেই। সে যাক, এখন তাকে খুঁজে বের করতে হবে মূর্তি দুটো কোন রুটে রাজধানী থেকে আউট হতে পারে সে তথ্য। যা এখনি না জানতে পারলে আজ রাতেই হয়ত রাজধানীর বাইরে চলে যাবে। যদিও রাজধানী এবং নিকটস্থ সকল থানায় ইনফরমেশন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে গোয়েন্দা দফতর থেকে।

কাদেরের বর্ণনা থেকে সম্ভাব্য সূত্রগুলো বের করে প্রত্যেকটা থানায় পাঠানো হয়েছে। গত ভোর রাত নবাবপুর রোড থেকে কোনদিকে কতগুলো ট্যাক্সি ক্যাব বেরিয়ে গেছে, বিভিন্ন সূত্র থেকে তারও একটা তালিকা ইতিমধ্যে সে সংগ্রহ করেছে। সেখান থেকে লং জার্নির দুটো ক্যাবকে মোটামুটি তিনি টার্গেট করেছেন। এর একটা গিয়েছে টঙ্গির দিকে আরেকটা সাভারের দিকে। দু'দিকেই শক্ত ইনফরমার সেট করা হয়েছে।

এসব কিছু নিয়েই গভীর পর্যবেক্ষণ করছেন ইন্সপেক্টর হারিস। এসময় তার মোবাইল বেজে ওঠল। মোবাইলে একটি সূত্র জানাল উত্তরা থেকে সন্দেহভাজন দুটো হলুদ ক্যাব রাত সাড়ে দশটার দিকে টঙ্গির দিকে যেতে দেখেছে। সূত্র আরো জানিয়েছে, দুটো ক্যাব একটি আরেকটিকে ফলো করছে বলে মনে হচ্ছে।

দুটো ক্যাবের কথা শুনে ইন্সপেক্টর হারিস আরেকবার ভাবনায় পড়ল। দুটো ক্যাব হবে কেন? ধরে নেয়া যাক, একটা কালা কফিলের। আরেকটা কার? পুলিশের কি? পুলিশের হলে সে জানত। নাকি কাদের গ্রুপ আর কালা কফিলের মধ্যে সমঝোতা হয়ে গেছে। যার ফলে দুগ্রুপ একত্রে রাজধানী ত্যাগ করছে?

না, এসব এলোমেলো ভাবনায় সময়ক্ষেপণ করার কোনো মানে হয় না। তারচে বরং এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। বেরিয়ে পড়ার আগে যে কাজটি তাকে আরেকবার করতে হবে, তাহলো ওয়ারলেসে স্পেশাল ব্রাঞ্চে মেসেজ পাঠিয়ে দেয়া। মি. হারিস তাই করল। স্পেশাল ব্রাঞ্চে প্রয়োজনীয় মেসেস পাঠিয়ে বেরিয়ে পড়ল দ্রুত।

কার এক্সিডেন্ট

হলুদ ট্যাক্সি ক্যাব কালা কফিল, কালু ও টুলুকে নিয়ে টঙ্গি পর্যন্ত আসতেই জ্যামে তাদের ক্যাব আটকা পড়ল। জ্যাম দেখে কালা কফিলের মেজাজ গেল চড়ে। মেজাজ ঠাণ্ডা করতে সামনের সিটের পেছনের দিকে সজোরে ঘুষি দিতে গিয়ে হাতের কব্জিতে প্রচণ্ড ব্যথা পেল। এতে মেজাজ গেল আরো চড়ে। এবার তার মেজাজের খেসারত দিতে হল টুলুকে। টুলুকে বলল, এই হালার পুত, নাইমা জ্যাম ছুডাস না ক্যান? এরপর পেছনের দিকে তাকিয়ে কালুকে বলল, যেই ক্যাবটা আমাগ ফলো করছিল সেইটা কি পুলিশের? নাকি কাদেইরার?

না না বস, কোনোটাই না। ফলো করলে এতক্ষণে আমাগ কাছাকাছি চইলা আইতো। আমাগ ফলো করতাছে এইরকম কোনো ক্যাব তো দেখতে পাইতাছি না। পেছনের দিকে উঁকি মেরে কালু বলল।

আরে কালু তুই এহনও ভালা কইরা পাকস নাই। হয়ত আমাগ জ্যামে পড়তে দেইখা ওই গাড়িটা ডাইনেবায়ে ব্রেক করছে। সময় মতো টান মারবো। আর নাহয় আমাগ চোখ ফাঁকি মাইরা সামনে চইলা গেছে।

টুলুকে বলল, এই টুলুর বাচ্চা এহনও নামস নাই? নাম হালার পো। আইলসামি করলে জান হারাইবি।

বসের কথার কোনোরকম প্রতিবাদ না করে গাড়ি থেকে নেমে জ্যাম ছাড়াতে চেষ্টা করছে টুলু। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও জ্যাম ছুটাতে পারল না। খবর নিয়ে জানতে পারল একটা বাস রিকসাকে ধাক্কা দিয়ে

TAXI

চ্যাপ্টা করে ফেলেছে। ওই চ্যাপ্টা রিকসা না সরানো পর্যন্ত জ্যাম ছুটবে বলে মনে হয় না।

টুলু গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে জ্যামের কারণ জানাল কালা কফিলকে। কালা কফিল বলল, ওই ব্যাটা ড্রাইভারকে গিয়া একটা লাথি মার।

ঠিক আছে বস। টুলু বসের হুকুম পালন করতে বাসের ড্রাইভারের দিকে পা ফেলল। কালা কফিল টুলুকে ফের ডাকল। টুলু ফিরে এল। কালা কফিল বলল, হালার পো, মাইর দেয়ার কথা হুনলে মাথা ঠিক থাকে না। ঘটনা ঘটাইবার বেলায় ওস্তাদ অইয়া যাও।

টুলু কিছু না বলে ক্যাবের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কালা কফিল কালুকে বলল, কালু তুইও যা। চ্যাপ্টা রিকসাডা একসাইডে নিয়া জ্যামডা ছুটাইবার চেষ্টা কর।

কালু ক্যাব থেকে নামার জন্য প্রস্তুতি নিল। এ সময় জ্যাম ছুটে গিয়ে সকল গাড়ি চলতে শুরু করল। কালা কফিল টুলুকে গাড়িতে ওঠার তাড়া দিয়ে ড্রাইভারকে বলল দ্রুত গাড়ি টান দেয়ার জন্য।

টুলু ফের ক্যাবে চড়ে বসার সাথে সাথে ক্যাব এগিয়ে গেল সামনের দিকে। কালা কফিল ড্রাইভারকে ক্যাব আরো দ্রুতবেগে চালাতে নির্দেশ দিলেও ড্রাইভার কালা কফিলকে হতাশ করে বলল, গাড়ির গ্যাস কইমা গেছে। গ্যাস নিতে অইব।

এ কথায় কালা কফিলের মেজাজে ফের মাত্রা পেল। মেজাজি গলায় ড্রাইভারকে বলল, তোর গ্যাসের গুষ্টি কিলাই। গ্যাস নিতে অইব না। আমাগ নামাইয়া দিয়া গ্যাস নিস।

ড্রাইবার গাড়ি চালাতে চালাতে স্বাভাবিক গলায় বলল, স্যার মেজাজ দেখাইয়েন না। গাড়ি চালাইতে হইলে গ্যাস নেয়া লাগবই।

কালু বলল, বস গ্যাস না নিলে গাড়ি বন্ধ হইয়া গেলে বেশি মশকিলে পড়তে হইব। তার থন গ্যাস নেয়াই ভালা।

কালুর কথায় কালা কফিলের মেজাজ একটু নরম হল। সে বলল, ঠিক আছে তাড়াতাড়ি গ্যাস ল। দেরি করিস না।

ড্রাইভার বলল, দেরিটা আমার উপর নির্ভর করব না। গাড়ির

লাইনের ওপর। এই যে বা দিকে গাড়ির লাইন দেখতাছেন, এইডা গ্যাসের লাইন।

পাম্প কই? কালা কফিল জানতে চাইল।

পাম্পের খবর নাই। মিনিমাম আধা কিলো দূরে অইব। ড্রাইভার জানাল।

হালার পুতে কয় কী? এই ব্যাটা ড্রাইভারের বাচ্চা গাড়ি থামা। আমরা তোর গাড়িতে যামু না।

না গেলে ভাড়া দিয়া নাইমা যান। আপনের মতো পেসেঞ্জার আমার লাগব না। আপনের ব্যবহার ভালা না। ড্রাইভার একপাশে গাড়ি রাখতে রাখতে বলল।

কালুর মেজাজও গেল খারাপ হয়ে। সে তার বসকে বলল, বস হারামজাদারে দিমু নাকি একটা মাইর? কী কইছে হুনছেন?

না না, মাইর দেওনের দরকার নাই। এখন সময় খারাপ। ঝামেলা করণ যাইব না। নাইমা আরেকটা ক্যাব দাঁড় করা। অন্যটায় চইলা যাই।

বসের অর্ডার পেয়ে ক্যাব থেকে নেমে গেল কালু। কালা কফিল পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট ড্রাইভারের হাতে দিল। টাকা পেয়ে ড্রাইভার বলল, কী দেন, পঞ্চাশ টেকা দেন ক্যান?

কত দিমু? কালা কফিল স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইল।

ষাট টেকা দেন। আপনের লোকের সাথে কন্ট্রাক হইছিল দুইশ টেকা।

দুইশ টেকা তো জয়দেবপুর পর্যন্ত যাওনের জন্য। কালা কফিল এবারও স্বাভাবিক ভঙিতে বলল।

আপনেরা নাইমা গিয়া তো আমার দুইশ টেকা লস করলেন।

কালা কফিল আর কথা না বাড়িয়ে আরো দশ টাকা বের করে মোট ষাট টাকা ড্রাইভারের হাতে তুলে দিয়ে বলল, গ্যাস নিতে কি বেশি দেরি অইব? দেরি বেশি না অইলে তোমার গাড়ি দিয়াই যাইতাম?

হ অনেক দেরি অইব। দুইতিন ঘণ্টা তো লাগবই।

কালা কফিল বুঝতে পারল যতই বলুক দুইশ টাকা লোকসান

হয়েছে, বাস্তবে ড্রাইভারের ইচ্ছা নেই তাদেরকে নিয়ে জয়দেবপুর যাওয়ার। তাই সে ভাবল, ক্যাব না পেলে কোনো লোকাল গাড়িতে চড়ে বসবে।

কিন্তু তা করতে হয়নি। কালু এসে বলল, বস তাড়াতাড়ি নামেন, ক্যাব পাওয়া গেছে।

কালা কফিল বলল, ঠিক আছে পেছন থেকে ঝটপট বাক্স দুইডা ওইটায় ভইরা ফেল। টুলু তুইও যা। দুইজনে দুইডা ল। সাবধানে নামাইস। দেখিস যেন ভাইঙা না যায়।

ঠিক আছে বস। কালু বলল।

টুলুও চটজলদি গাড়ি থেকে নামল। কালা কফিল পেছনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ক্যাব থেকে নেমে গেল। নেমে প্রায় দৌড়ে গিয়ে নতুন ক্যাবে ওঠল।

কালা কফিলরা চলে যাওয়ার পর ক্যাবের ড্রাইবার স্বগতোক্তি করে বলল, বেটা বদমাইশের দল। তোরা যে খারাপ আদমি আমি বুঝতে পারছি। এই জন্যই মিছা কথা কইয়া তোগ নামাইয়া দিলাম। আমার গাড়িতে গ্যাসের যেমন কোনো অভাব নাই তেমন গ্যাস নেওনেরও দরকার নাই।

ড্রাইভার গাড়িতে ওঠে ফের গাড়ি স্টার্ট দিল। গাড়ি সামান্য পেছনে টান দিয়ে উত্তরার দিকে ঘুরিয়ে দিল।

দূর থেকে তা লক্ষ করল টুলু।

টুলু তার বসকে বলল, বস দ্যাহেন ওই হারামজাদা গ্যাস না নিয়া চইলা যাইতাছে। আমাগ লগে মিছা কথা কইছে। আসলে হারামজাদার গ্যাস ফুরায় নাই।

বাদ দে ওইসব। কালা কফিল বলল। এরপর নতুন গাড়ির ড্রাইভারকে বলল, ড্রাইভার জোরে টান দেও।

জোরেই টান দিমু। টেকা বাড়াইয়া দিতে হইব স্যার। ড্রাইভার বলল।

ঠিক আছে দিমু। আগে টান দেও। কালু বলল।

ড্রাইভার টাকা বেশি পাওয়ার আশ্বাস পেয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। গাড়ি ছুটে চলল টঙ্গি ছেড়ে জয়দেবপুরের দিকে।

একটানে গাড়ি বোর্ডবাজার ছেড়ে আরেকটু এগিয়ে গেছে।

তখনি কালা কফিল দেখল রোডের বা-পাশে তাদের ফলো করা সেই ক্যাবটা দাঁড়িয়ে আছে। সে কালু ও টুলুকেও গাড়িটা দেখিয়ে বলল, খাইছে আমারে! দেখছস ওই গাড়িটা আমাগ ফলো করছে। ওই দেখ, গাড়ির বাতি অফ কইরা এক হারামি ওত পাইতা দাঁড়াইয়া রইছে।

তবে কালা কফিলদের গাড়ি সন্দেহভাজন গাড়িটাকে পাশ কেটে চলে গেলেও গাড়িটার গতিবিধি পরিবর্তন বা তাদেরকে কোনো প্রকার থামার চিহ্ন দিল না। তাহলে গাড়িটা তাদের ফলো করছে কেন? নাকি মনের ভয়? হতেও পারে।

এই ভেবে কালা কফিল নির্ভিক থাকার চেষ্টায় গাড়ির ভেতরে পুনরায় নড়েচড়ে বসল। ড্রাইভারকে আরো টেনে চালাতে বলল। ড্রাইভার কোনো কথা না বলে একই গতিতে গাড়ি চালাতে লাগল।

গাড়ি এখন বোর্ড বাজার ছেড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। পেছনে উঁকি দিয়ে কালা কফিল দেখল একটা ট্রাক ছাড়া আর কোনো গাড়ি নেই পেছনে। যাক বাঁচা গেল। আপাত হাফ ছেড়ে বাঁচল কালা কফিল। এবার নির্ভয়ে জয়দেবপুর চৌরাস্তায় যেতে পারলেই চলে। সেখানে তার বন্ধু সফিক নিজের গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। রাজধানীর বাইরে মূর্তি দুটো পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব সফিকের গ্রুপের। সফিককে একটা ফোন দেয়া দরকার। পকেট থেকে মোবাইল বের করে সফিককে ফোন করল কালা কফিল। সফিক ফোনে জানাল অসুবিধা নেই। সে তার গাড়ি নিয়ে চৌরাস্তা ছেড়ে বামে মোড় নিয়ে টাঙ্গাইলের দিকে যে রাস্তা গেছে সেখানে অপেক্ষা করছে।

এদিকে তাদের গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। সামনে শুধুই পিচঢালা কালোপথ। যা তাদের গাড়ির সার্চলাইটে আলোকিত করে রাখছে। হঠাৎ পেছন থেকে একটা ঠুস শব্দ ভেসে এলো। মনে হল শব্দটা ঠিক তাদের গাড়ির ওপর এসে আছড়ে পড়েছে। শঙ্কা নিয়ে পেছনে তাকাল কালা কফিল, কালু ও টুলু। সর্বনাশ! সেই গাড়িটাই তো!

গাড়িটা তাদের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে। বলতে না বলতে আরো কাছে। এবং তাদেরকে কিছু ভাবতে না দিয়ে আরেকবার শব্দ হল। এবার আর বুঝতে বাকি রইল না যে পেছনের গাড়ি থেকে তাদেরকে গুলি করা হচ্ছে। দ্বিতীয় গুলিটা তাদের গাড়ির পেছনের গ্লাস ছেদ করে এসে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। তবে সবাই অক্ষত রইল।

কালা কফিল ড্রাইভারকে বলল, এই পেছনে ডাকাত পড়েছে দ্রুত চালাও। এবার ড্রাইভারও যেন ভয় পেয়েছে। ডাকাতের ভয়। সে গাড়ির গতি চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেল।

তাতেও শেষ রক্ষা হল না। একটা গুলি এসে টুলুর মাথা ছেদ করে বেরিয়ে গেল। টুলু ঢলে পড়ল গাড়ির ছিটে। কালা কফিলের সেদিকে খেয়াল করার সময় নেই। সে তাড়াতাড়ি কোমড় থেকে তার পিস্তল বের করে পেছনের গাড়ি লক্ষ করে গুলি চালাল। গুলি লক্ষভ্রষ্ট হল। তবে পেছনের গাড়িটা গতি কমিয়ে কিছুটা পেছনে সরে গেল। পেছনে সরে গেলেও পেছনের গাড়িটা গুলি চালানো বন্ধ করল না। কালা কফিল পাল্টা জবাব দিল। এভাবে গুলি বিনিময় হতে থাকল কিছুক্ষণ।

একসময় কালা কফিলের গুলি শেষ হয়ে গেল। সম্ভবত গুলি শেষ হয়ে গেছে পেছনের গাড়িরও। গুলি ছোড়া বন্ধ আছে উভয় পক্ষের। তবে পেছনের গাড়ির গতি বেড়ে গেল।

পেছনের গাড়িটা দ্রুত এগিয়ে এসে তাদের গাড়ির সামনে গোত্তা খেল। এতে তাদের গাড়ি টাল সামলাতে না পেরে রাস্তা থেকে কাচা রাস্তায় ওঠে গেল। ড্রাইভার তার কৌশল অবলম্বন করে গাড়ি ফের পিচঢালা পথে নিয়ে এলো। ড্রাইভার গাড়ি সামনের দিকে টান দিতে দিতে বলল, স্যার, দয়া কইরা আমার গাড়ি থেকে নাইমা যান। আপনেগ জন্য আমি মরতে চাই না।

সাথে সাথে কালা কফিল ড্রাইভারের মাথায় পিস্তলের বাট দিয়ে সামান্য আঘাত করে বলল, কথা কম ক, চুপচাপ গাড়ি চালা । বেশি কথা কইলে ফুটা কইরা দিমু।

ড্রাইভার ভয়ে আর কোনো কথা বলল না।

কালু বলল, বস টুলু ত মইরা গেছে।

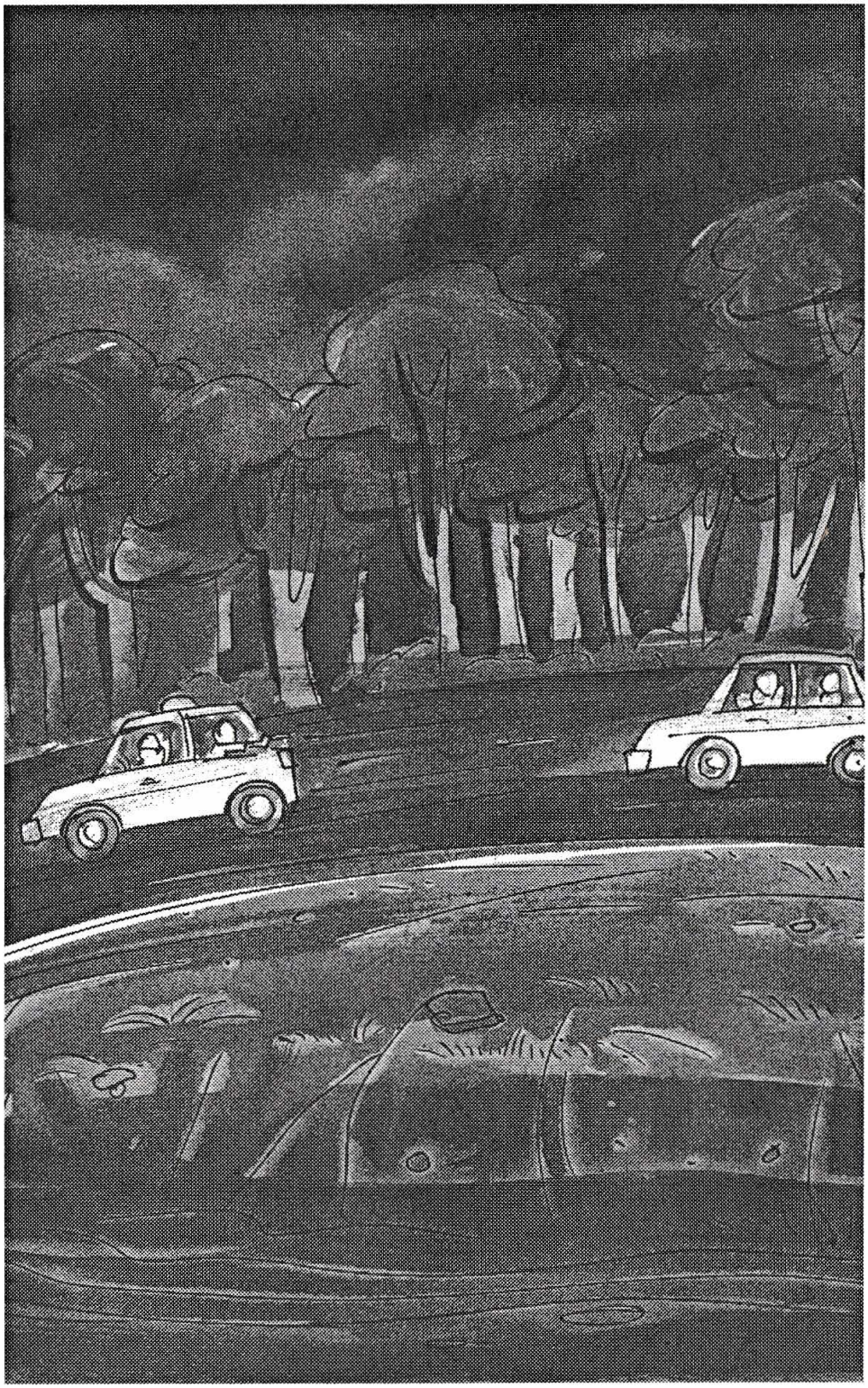

কস কী? কালা কফিল কেঁপে ওঠল। অর গুলি লাগছে কহন?

জানি না বস।

কালা কফিল পেছনে তাকিয়ে দেখল শত্রুর গাড়িটা কিছুটা দূরে আছে। তাই কালুকে বলল, টুলুরে রাস্তার পাশে ফালাইয়া দে। লাশ লইয়া বিপদ আর বাড়াইতে চাই না।

বসের অর্ডার পাবার সাথে সাথে ক্যাবের দরজা খুলে টুলুর মৃতদেহটা চলন্ত গাড়ি থেকে রাস্তায় ফেলে দিল কালু।

ড্রাইভার ভয়ে কোনো কথা বলল না।

এরই মধ্যে পেছনের গাড়িটা ফের তাদের পাশাপাশি হয়ে কালা কফিলকে লক্ষ করে গুলি চালাল। চলন্ত গাড়ি হবার কারণে গুলি লক্ষভ্রষ্ট হল এবারও। Banglapdf.net

দ্বিতীয়বার গুলি না করে কালা কফিলের গাড়িটাকে পেছনের গাড়িটা এসে ধাক্কা দিল।

হঠাৎ কালা কফিলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল সে যা ভেবেছে তা নয়। অন্য গাড়িটা পুলিশের নয়। কাদেরের।

তাহলে কাদেরই তাকে শুরু থেকে ফলো করছিল? কালা কফিল কিছু ভেবে সময় নষ্ট না করে এক লাফে সামনের সিটে গিয়ে ড্রাইভারকে বলল, এই বেটা সইরা ব।

ড্রাইভার সরে এলো তার সিট থেকে। কালা কফিল গিয়ে গাড়ির হুইল ধরল। এবার সমানতালে অন্যগাড়ির সাথে টক্কর দিয়ে চলতে শুরু করল। কালা কফিল কাদেরের গাড়িটাকে কয়েকবার ধাক্কা দিতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল।

এরই মাঝে কালা কফিল তার লুকিং গ্লাসে দেখতে পেল একটা মোটর সাইকেল তাদের পেছনে পেছনে আসছে। কালা কফিল বুঝতে পারল বিপদ চারপাশ থেকে তাদেরকে আকড়ে ধরছে।

গাড়ির ড্রাইভারও চিৎকার-চেচামেচি শুরু করে দিল। তার চেচামেচিতে কালু পেছন থেকে পিস্তলের বাট দিয়ে ড্রাইভারের মাথায় সজোরে আঘাত করল। সাথে সাথে ড্রাইভার সিটে লুটিয়ে পড়ল। কালা কফিল তা খেয়াল করল না। সে চূড়ান্ত গতিতে গাড়ি ছুটাল আর

রাস্তার দু'পাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখল গাড়ি থেকে নেমে পালানো যায় কিনা?

এদিকে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর হারিস দ্রুত মোটর সাইকেল চালিয়ে দুর্বৃত্তদের প্রায় কাছাকাছি চলে এলেও নিরাপদ দূরত্বে রেখে গাড়ি চালাচ্ছে। সে বুঝতে পারল কালা কফিলের সাথে অন্য একটা গ্রুপের গোলাগুলি হচ্ছে। সম্ভবত অন্য গ্রুপটা কাদেরের। সে যাই হোক, আজ দু'গ্রুপকেই সে হাতেনাতে ধরতে পারবে। তাকে সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় প্রতিটা থানায় ইনফর্ম করা হয়েছে। অলরেডি টঙ্গি থানার পুলিশ তার পেছনে পেছনে এগিয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, জয়দেবপুর পর্যন্ত সকল থানা প্রস্তুত রয়েছে কালা কফিলদের ধরার জন্য।

হঠাৎ গুলির শব্দ শুনে ইন্সপেক্টর হারিস আরো সতর্ক হল এবং ওদেরকে ফলো করে এগিয়ে গেল। একসময় সে বুঝতে পারল কালা কফিলদের গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। তাই দ্রুত বেগে এগিয়ে গেল সে। এগিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত গাড়ি দুটোর একেবারে কাছাকাছি চলে গেল।

ঠিক তখনি দুর্ঘটনাটা ঘটল। সংঘর্ষের কারণে দুটো ক্যাবই রাস্তার পাশে সিটকে পড়ল।

মি. হারিসের চোখের সামনে গাড়ি দুটো এক্সিডেন্টে ধলেমুচড়ে গেল।

ইন্সপেক্টর হারিস গাড়ি দুটোর কাছাকাছি গিয়ে মোটর সাইকেল থামাল। গাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে আসছে।

আমাকে বাঁচাও- কে আছো, আমাকে বাঁচাও-

আর্তনাদ শুনে ইন্সপেক্টর হারিস এগিয়ে গেল। যেতে যেতে ওয়ারলেসে কোথাও ম্যাসেস পাঠাল।

এদিকে তার পেছনে পেছনে আরো দুটো পুলিশ ভ্যান এসে সেখানে থামল। ভ্যান থেকে টঙ্গি থানার ওসি নিজামসহ ভ্যানের সকল পুলিশ দ্রুত নেমে এক্সিডেন্ট হওয়া গাড়ি দুটোর কাছে গেল।

টর্চ জ্বেলে গাড়ির ভেতরে উঁকি দিল ওসি নিজাম। আবারো সেই আর্তনাদ শোনা গেল। আর্তনাদ লক্ষ করে টর্চ মারল পুলিশের দারোগা

মজনু মিয়াও। দেখল একটা লোক যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে।

ইন্সপেক্টর হারিসও দেখল লোকটাকে। লোকটার পরিচয় জানা যাবে পরে। আগে তাকে সুস্থ করে তুলতে হবে। তাই দারোগা ওসি নিজামকে ইন্সপেক্টর হারিস বলল, ওসি সাহেব, ওকে কাছের কোনো হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

তার কথায় ওসি নিজাম দারোগা মজনু মিয়াকে দ্রুত নির্দেশ দিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

জ্বি স্যার, আমি এখনি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। মজনু মিয়া বলল।

এর মধ্যে ফায়ার বিগ্রেডের গাড়িও সেখানে এসে উপস্থিত হল। তাদের দল এসে দ্রুত আহত লোকটাকে উদ্ধার করল।

উদ্ধারের পর আহত লোকটা গোঙাতে গোঙাতে ইন্সপেক্টর হারিসকে বলল, স্যার, আমার নাম কাদের। আইজ সকালে ফোনে আপনের সাথে কথা হইছে। কালা কফিলকে ধরুন স্যার। ওর কাছে কষ্টি পাথরের মূর্তি দুইডা আছে।

কালা কফিল কোথায়? ইন্সপেক্টর হারিস জানতে চাইল।

কাদের এক্সিডেন্ট হওয়া পাশের গাড়িটা দেখিয়ে দিল।

ইন্সপেক্টর হারিস দেখল অন্য গাড়িটা রাস্তার পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। সে দেরি না করে কালা কফিলের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। টর্চ জ্বেলে গাড়ির ভেতর উঁকি দিয়ে দেখল সামনের সিটের বা দিকে একটা লোক রক্তাক্ত পড়ে আছে। ড্রেস দেখে বুঝতে পারল সে ট্যাক্সি ড্রাইভার। এছাড়া পেছনের সিটেও আরেকজন একই অবস্থায় পড়ে আছে। ইন্সপেক্টর হারিসের নির্দেশে দুজনকেই দ্রুত উদ্ধারের চেষ্টা করল ফায়ার বিগ্রেডের লোকজন। উদ্ধারের পর বুঝতে পারল দুজনই মারা গেছে। ইন্সপেক্টর হারিসের নির্দেশে মৃত দুজনের লাশ পুলিশের গাড়িতে ওঠানো হল। তার আগে দু'জনের লাশই কাদেরকে দেখানো হল। কাদের জানাল এদের একজনও কালা কফিল নয়। ড্রাইভার ছাড়া অন্যজন কালা কফিলের সহযোগী।

ওসি নিজামসহ ইন্সপেক্টর হারিস আশেপাশে রাস্তার ঢালুতে টর্চ

জ্বেলে খোঁজ করল কালা কফিল এবং আর কেউ আহত কিংবা নিহত হয়ে পড়ে আছে কিনা।

না, কোথাও কোনো আহত কিংবা নিহত আর কাউকে দেখতে পেল না তারা। তাহলে কালা কফিল গেল কোথায়?

ইন্সপেক্টর হারিস একপ্রকার ব্যর্থ হয়ে যখন ফিরে যাবে ভাবছিল, তখনি রাস্তার নিচ থেকে গোঙানির শব্দ ভেসে এল। তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে নিচের দিকে গেল ইন্সপেক্টর হারিস। অন্য পুলিশরাও তাকে ফলো করল। ইন্সপেক্টর হারিস দেখতে পেল রাস্তার একেবারে নিচে পানিতে একজনের রক্তাক্ত অসাড় দেহ পড়ে আছে। ইন্সপেক্টর হারিসের নির্দেশে দুজন পুলিশ গিয়ে আহত লোকটাকে টেনে তুলল। লোকটার সারা শরীরে যখম। মাথার একপাশ থেতলে এবং বা-হাত দেহ থেকে প্রায় আলাদা হয়ে গেছে। থেমে গেছে লোকটার গোঙানি। লোকটা কি মারা গেছে?

ইন্সপেক্টর হারিস ওসি নিজাম-এর সাথে চুপে চুপে কী যেন আলাপ করে পুলিশদের নির্দেশ দিলেন রক্তাক্ত অসাড় দেহটাকে গাড়িতে তোলার জন্য।

লোকটাকে পুলিশের ভ্যানে তোলার জন্য আগলে ধরল পুলিশ। লোকটাকে ভ্যানে তোলা হল। তখনি চিৎকার করে ওঠল কাদের। বলল, স্যার এই হারামজাদার নাম কালা কফিল। অর গাড়ি চেক করলে মূর্তি দুইডা পাইতে পারেন।

ইন্সপেক্টর হারিস ও ওসি নিজাম পুলিশ ভ্যান থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। কাদেরের চিৎকার শুনে ভ্যানের কাছে ছুটে এল।

কালা কফিলকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করল। এরপর ছুটে গেল কালা কফিলের গাড়ির কাছে।

গাড়ির সব জায়গা খুঁজে শেষে পেছনের কাভার তুলতেই দেখল দুটো বাক্স। উবু হয়ে গাড়ি থেকে বাক্স দুটো নামাল। দ্রুত খুলল বাক্স দুটো। ইন্সপেক্টর হারিস দেখল দুটো বাক্সে কষ্টি পাথরের কালো দুটো মূর্তি রাখা আছে। উল্লাসে ফেটে পড়ল ইন্সপেক্টর হারিস আর ওসি নিজাম।

বাক্স দুটো তাড়াতাড়ি ওসির গাড়িতে রাখল। এরপর ওসি নিজাম

দারোগা মজনু মিয়াকে অর্ডার দিলো কালা কফিলের অসাড় দেহ আর কাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মজনু মিয়া কাদের ও কালা কফিলের রক্তাক্ত অসাড় দেহ নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হল।

ইন্সপেক্টর হারিস ওসি নিজামকে বলল, চলুন যাওয়া যাক।

হ্যাঁ চলুন।

এরপর মোটর সাইকেলে চড়ল ইন্সপেক্টর হারিস।

ওসির গাড়ি এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

কষ্টিপাথরের দামি মূর্তি উদ্ধার করে ইন্সপেক্টর হারিসের মোটর সাইকেলও ওসির গাড়িকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেল।

শেষ সংবাদ

পরের দিন দেশের সকল দৈনিকের প্রধান শিরোনাম হিসেবে গতরাতে কালো মূর্তি উদ্ধারের খবর ছাপা হল। কীভাবে মূর্তি উদ্ধার হয়েছে তারও বিস্তারিত ছাপা হয়েছে খবরে।

গুরুতর আহত পাচারকারি দলের দুই প্রধান কালা কফিল আর কাদেরকে হাসপাতালে নেয়ার পরপরই মারা গেছে।

পত্রিকাগুলো পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে উদ্ধারকৃত কষ্টিপাথরের মূর্তি দুটো আপাতত পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়েছে। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে জাতীয় জাদুঘরে রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

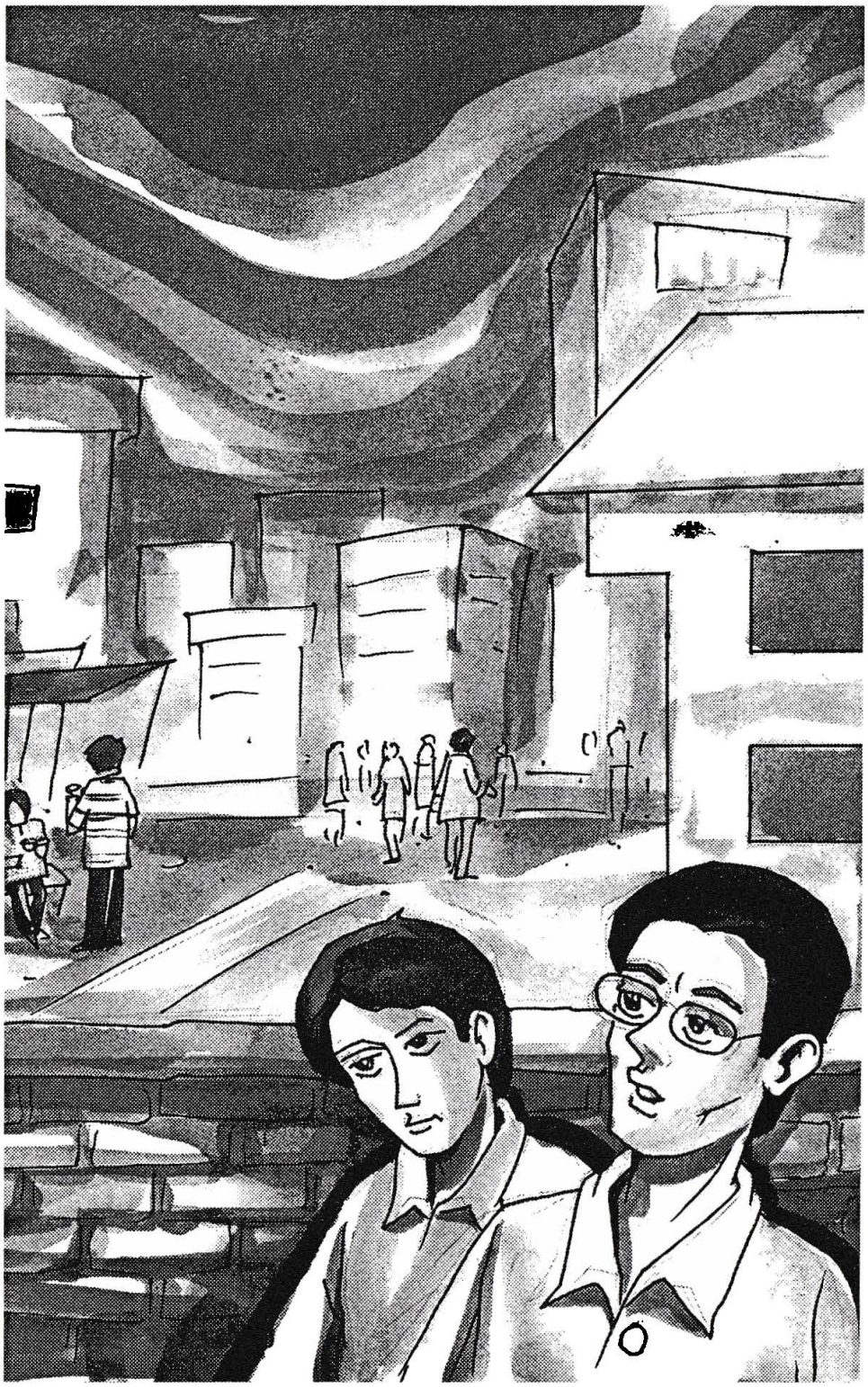

লাইট হাউজ হত্যারহস্য

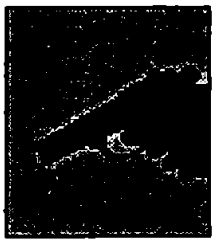

দুই কিশোর

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মি. হারিস তার মোটর সাইকেল নিয়ে লাইট হাউজের গলির ভেতর ঢুকলেন। ঢুকে গাড়ির গতি কমিয়ে দিলেন। তার পেছনে পেছনে আলাদা মোটর সাইকেলে আসছিল তার জুনিয়র মি. বাতেন। বাতেন তার গাড়ি একটু টেনে এগিয়ে এসে তার বসের পাশাপাশি অবস্থানে এগোতে লাগল।

মি. হারিস জুনিয়রকে বলল, বাতেন, তুমি একটা কাজ করো।

জ্বি বস, কী করতে হবে বলুন। আগ্রহের সাথে মি. বাতেন বলল।

মি. হারিস রাস্তার একপাশে তার গাড়ির স্টার্ট পুরোপুরি বন্ধ করে বলল, তুমি একটু পেছনে চলে যাও। গিয়ে লাইট হাউজের পেছনের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

ওকে বস। আর কী করতে হবে?

মি. হারিস চোখের ইশারায় গলির শেষ মাথার চায়ের দোকানটা দেখিয়ে বললেন, ওই যে দেখতে পাচ্ছ দুটো কিশোর লাইট হাউজের সামনের চায়ের দোকানে চা খাচ্ছে?

জ্বি বস।

ওদেরকে আমার সন্দেহ হচ্ছে। ওদের আটকাতে হবে। আমি গাড়ি নিয়ে ওদিকে এগোচ্ছি, ওরা যদি আমাকে দেখে সটকে পরে তাহলেই বুঝতে পারব যে আমরা পজেটিভলি এগোচ্ছি। কারণ ঘটনার পর থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি, ওই ছেলেগুলো চায়ের দোকানটায়

আড্ডা মারছে। শুধু তাই নয়, ওরা লাইট হাউজের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে প্রায়ই। আমার মনে হয়, মতি হত্যাকাণ্ডের সাথে ওদের কোনো যোগসূত্র রয়েছে। বাই দ্য ওয়ে, নাউ ওদের বেরোবার একটাই পথ, লাইট হাউজের পেছনের রাস্তাটা। তুমি লাইট হাউজের পেছনের রাস্তায় না ঢুকে রাস্তার মাথায় থাকবে এবং ওদেরকে আটকাবে। আমি সামনের দিক থেকে ওদের তাড়া করব, ওকে?

ওকে বস। আমি এখনি যাচ্ছি।

মি. বাতেন গাড়ি নিয়ে দ্রুত লাইট হাউজের পেছনের রাস্তায় গেল। মি. হারিস পুনরায় তার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে গেল।

লাইট হাউজের পেছনের রাস্তাটি খুবই নীরব। লোকজনের চলাফেরা একেবারেই কম। মতি খুন হবার পর আরো বেশি সুনসান হয়ে গেছে। রাস্তার উত্তর মাথায় যে চায়ের দোকানটি রয়েছে, সেখানেও দুজন কিশোর ছাড়া আর কোনো কাষ্টমার নেই। কিশোর দুটো চা খেতে খেতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তাকাচ্ছে লাইট হাউজের দিকেও।

লাইট হাউজ নামের এপার্টমেন্টটি রাস্তার ঠিক মাঝামাঝি অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে একদঙ্গল শোক নিয়ে। কারণ এই ফ্লাটের তৃতীয় তলার বাসিন্দা আফজাল সাহেবের ছেলে মতি খুন হয়েছে চারদিন আগে। খুন হবার দিন মতিকে একই ফ্লাটের আরেক বাসিন্দা রফিক সাহেবের ছেলে রনি ডেকে নিয়ে গেছে ক্রিকেট খেলার কথা বলে। ঘটনার পর থেকে রনিও নিঁখোজ রয়েছে। রনি আর মতি ছিল খুবই ঘনিষ্ট বন্ধু। ওদের মধ্যে কোনো বিবাদও ছিল না বলে বাদী-বিবাদী ও এলাকার লোকজন জানিয়েছে। এরপরও রনি কেন মতিকে খুন করতে যাবে এই প্রশ্ন সকলের মতো মি. হারিসেরও।

যে করেই হোক কেসটার একটা কিনারা করতে হবে।

এই ভেবে মি. হারিস সতর্ক দৃষ্টি রেখে গাড়ি নিয়ে লাইট হাউজ ছেড়ে চায়ের দোকানের ঠিক কাছাকাছি গিয়ে পৌছলেন। তিনি দেখতে পেলেন একটু আগেও দাঁড়িয়ে থাকা কিশোর দুটোও তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ধীর পায়ে দোকানের পাশ দিয়ে যে সরু রাস্তাটা পুব দিকে গেছে তাতে ঢুকে গেল।

মি. হারিসও গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন সেদিকে। গিয়ে রাস্তার ঠিক মাথায় দাঁড়ালেন। যাতে কিশোর দুটো ফের এদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে। অবশ্য কিশোর দুটোও বেরোবার চেষ্টা না করে সরু রাস্তা ধরে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

যায় যাক, রাস্তার শেষ মাথায় মি. বাতেন দাঁড়িয়ে আছে। এই ভেবে মি. হারিস ধীরে ধীরে গাড়ি নিয়ে সামনে এগোলেন।

এদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে লাইট হাউজের পেছনের রাস্তার শেষ মোড়টায় এসে দাঁড়াল মি. বাতেন। দাঁড়াল একটু আড়ালে। দাঁড়িয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখল রাস্তার দিকে। দেখল চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোর দুটো এগিয়ে আসছে দ্রুত পা ফেলে। মি. বাতেন নিজেকে প্রস্তুত রাখল। যাতে কিশোর দুটো দৌড়ে পালিয়ে যেতে না পারে। কিশোর দুটো হ্যাংলা-টিংটিংয়ে, কাবু করতে খুব একটা কষ্ট হবে না তার।

কিশোর দুটো গোয়েন্দা উপস্থিতি টের পেয়ে হেটে আসতে আসতে হঠাৎ দৌড় দিল এবং মি. বাতেনকে ক্রস করে বেরিয়ে গেল। মি. বাতেন দ্রুত মোটর সাইকেল স্টার্ট দিয়ে ওদেরকে ধাওয়া করল। এগিয়ে এল মি. হারিসও।

কিশোর দুটো সতর্ক থাকলেও খুব যে চালাক তা বলা যাবে না। কারণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা কোনো গলিতে না ঢুকে মূল রাস্তা ধরেই দৌড়াতে থাকল। ফলে যা ঘটার তাই ঘটল। মি. বাতেন তার চলন্ত মোটর সাইকেল থেকে দুই কিশোরকে এক এক করে কিক মেরে রাস্তার একপাশে ফেলে দিল।

মি. হারিসও এগিলে এল।

সাথে সাথে দুই কিশোরকে আটকে ফেলল তারা। আটকে দু-কিশোরকেই হাতকড়া লাগিয়ে দিল দ্রুত।

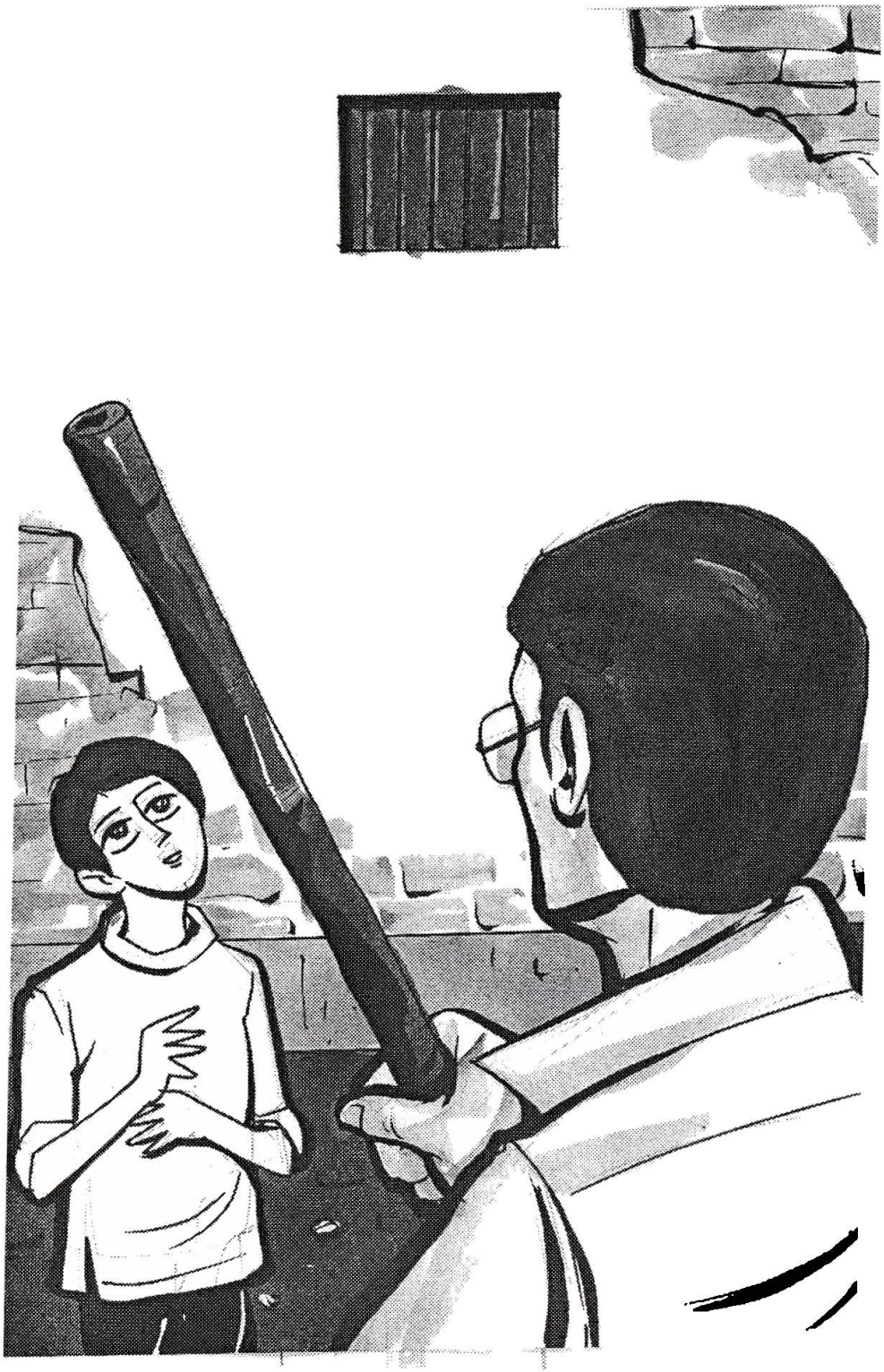

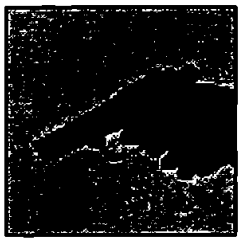

গোয়েন্দাসেলে দুই কিশোর

দুই কিশোর রকি আর বাবুকে ধরে এনে গোয়েন্দা অফিসের দুটো আলাদা সেলে রাখা হয়েছে। রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বাবুকে ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তার কাছে মতি হত্যার কিছু তথ্যও পাওয়া গেছে। এখন রকিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পালা। মি. হারিস বুঝতে পেরেছেন রকিটা একটু ধুরন্দর। ওকে সাবধানে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

রকিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য রকির সেলে ঢুকলেন মি. হারিস চৌধুরী। ঢুকেই দেখেন সেলের একপাশে বসে রকি কাঁদছে। মি. হারিস সেলে ঢোকার সাথে সাথে কান্না থামিয়ে ওঠে দাঁড়াল রকি।

ডোন্ট ক্রাই – কাঁদলে শাস্তির মাত্রা বেড়ে যাবে, এই যে ডাণ্ডা দেখতে পাচ্ছিস, এটা দিয়ে এমন পেটান পেটাবো তাতে তোর হাড়গোড় সব গুড়ো হয়ে যাবে। এখন বল যা যা প্রশ্ন করবো তার ঠিক ঠিক উত্তর দিবি? কী দিবি তো?

জ্বি স্যার..। রকি বলল।

মি. হারিস রকির কাছে ওদের ঠিকানা জানতে চাইলেন।

তোদের বাসা কোথায়?

খিলগাঁয়ে স্যার।

চায়ের দোকানে কী করছিলি?

চা খাইতে গিয়েছিলাম।

খিলগাঁ থেকে চৌধুরীপাড়া কেন চা খেতে এসেছিস? খিলগাঁয়ে চায়ের দোকান নেই?

আছে স্যার। আমার এক বন্ধু চৌধুরীপাড়া থাকে স্যার। অর কাছে আইছিলাম।

ওর নাম কি?

মিন্টু।

মিন্টু কী করে? লেখাপড়া নাকি অন্যকিছু?

ব্যবসা করে স্যার। অর বাপের লগে রেললাইনে কাঁচামালের ব্যবসা করে।

মিন্টুকে পেয়েছিলি?

জ্বি না স্যার, অয় নাকি অর মামার বাড়ি গেছে।

কবে গেছে?

জানি না স্যার।

মিন্টুর মামার বাড়ি কোথায়?

নারায়ণগঞ্জ স্যার।

নারায়ণগঞ্জের কোথায়?

বন্দরে।

মতিকে চিনিস নাকি?

কোন মতি স্যার?

তুই কোন মতিকে চিনিস?

আমি কোনো মতিকে চিনি না।

তাহলে যে বললি কোন মতি? এই বয়সে বেশ মারপ্যাচ শিখে গেছিস না?

মি. হারিস রকির পাছায় কষে এক ঘা বসিয়ে দিল হাতের লাঠি দিয়ে। 'ওরে বাবারে' বলে চিৎকার করে ওঠে রকি। বাঁ-হাত দিয়ে পাছা ঢলতে থাকে।

স্যার, আল্লার কসম, আমি কিছুই জানি না।

কী কিছুই জানিস না?

যা জানতে চাইতাছেন স্যার?

আমি তো জানতে চেয়েছি তোদের বাসা কোথায়, চৌধুরীপাড়া কেন এসেছিস, তোর বন্ধুর মামার বাড়ি কোথায়– এসব।

এগুলান তো কইলামই স্যার।

ও হ্যাঁ, বলেছিসই তো; তুই কি করিস?

মেট্রিক পাশ করছি স্যার। কলেজে ভর্তি হমু।

ও আচ্ছা... তোর বন্ধু বাবুও কি কলেজে ভর্তি হবে?

জ্বি-না স্যার, অয় বেকার, লেহাপড়া করে না।

একটা মূর্খ ছেলে তোর বন্ধু হয় কী করে? আমরা তো খবর পেলাম বাবু আর তুই ছিনতাই করিস।

জ্বি-না স্যার, আমি ভদ্র ফ্যামিলির পোলা। আমার বাপে সরকারি চাকরি করে।

কিন্তু বাবু তো বলল, ওকে ফুসলিয়ে নিয়ে তুই কয়েকটা ছিনতাই করেছিস। ও নাকি যেতে চায়নি।

মিথ্যা কথা স্যার।

কোনটা মিথ্যা? তুই ফুসলিয়ে নিয়ে গেছিস এটা?

জ্বি স্যার।

তাহলে বাবু নিজের ইচ্ছেতেই গেছে?

জ্বি স্যার।

এ কথা বলার সাথে সাথে রকির পাছায় ফের কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন মি. হারিস চৌধুরী। রকিকে ফের প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে বললেন, তাহলে তুই যে বললি তুই ভদ্র ঘরের ছেলে। কোনো ভদ্র ঘরের ছেলে কখনো ছিনতাই করে?

স্যার, আমিও করি না।

শুধু বাবু ছিনতাই করে বেড়ায়, তাই তো?

জ্বি স্যার।

তাহলে বল, কোনো ভদ্র ঘরের সন্তান কখনো কোনো ছিনতাইকারীর সাথে বন্ধুত্ব করে?

স্যার প্রথমে আমি জানতাম না বাবু ছিনতাই করে। বন্ধু হবার পর জানতে পারছি। স্যার, আমারে ছাইড়া দেন, আর কহনো বাবুর সাথে চলুম না।

ওকে, ভেরি গুড। সত্য কথা বলার জন্য তোকে ছেড়ে দেব। তবে তার আগে আরেকটা সত্য কথা বলতে হবে তোকে। সত্যি করে বলতো, ওই চায়ের দোকানে তোরা কেন ছিলি? আগে তো তোদের

কখনো দেখিনি, মতি খুন হবার পরই তোরা ওখানে ঘোরাফেরা করছিস। আমি জানি মিন্টু নামের তোদের কোনো বন্ধু নেই। ওটা তোদের কাল্পনিক বন্ধু। আমি আরো জানতে পেরেছি মতির খুনের সাথে আরো কয়েক জনের সাথে তুই আর বাবু জড়িত। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার লুকোচুরির চেষ্টা করবি না। লুকোচুরি করতে গেলে বিপদে পরবি। এমনভাবে কেসটার চার্জসিট দাখিল হবে যাতে কোনোদিন বেরোতে না পারিস। আর যদি সত্য সত্য বলিস তো চার্জসিটে তোকে রাজসাক্ষী করা হবে। একসময় তুই মুক্তি পেয়ে যাবি। ওকে?

জ্বি স্যার।

তাহলে বল মতির খুনের সাথে কে কে জড়িত ছিল?

আমি জানি না স্যার।

এবার মি. হারিসের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তিনি রীতিমতো ক্ষেপে গেলেন রকির ওপর। হাতের লাঠি দিয়ে পেটালেন রকিকে। রকি বাবারে-মারে বলে চিৎকার শুরু করে দিল। মারতে মারতে রকিকে বলল, হারামির দল, এই বয়সে খুনখারাবির সাথে জড়াইয়া গেছিস; তোদের এখনই সাইজ না করলে জাতির ভবিষ্যত খুব খারাপ। তোকে পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে গেলাম। এর মধ্যে যদি সত্যি না বলিস তো তোকে একনম্বর খুনি করে চার্জসিট দাখিল করবো।

মি. হারিস চৌধুরী আর কোনো প্রশ্ন না করে সেল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

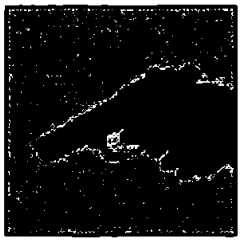

একটি দৈনিকের রিপোর্ট

রকি আর বাবু ধরা পরার পরের দিন নিজস্ব ক্রাইম রিপোর্টার এর বরাত দিয়ে দৈনিক আজকের হালচাল পত্রিকায় মতির খুনের ব্যাপারে একটি স্পর্শকাতর খবর ছেপেছে। যা পড়ে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মি. হারিস তো বটেই মি. বাতেনও খুব অবাক হল। খবরটি মনোযোগের সাথে পড়ল মি. হারিস এবং জুনিয়র বাতেনকেও পড়ার জন্যে নিজের টেবিল থেকে বাতেনের টেবিলে ঢিল ছুড়ে দিলেন। মি. বাতেন খবরটি চোখের সামনে তুলে ধরলেন:

> লাইট হাউজের খুনের কোনো সুরাহা করতে পারেনি পুলিশ
>
> *খবর নিজস্ব সংবাদদাতা :*
> *ঘটনার পর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেলেও মালিবাগস্থ লাইট হাউজের কিশোর মতি খুনের কোনো রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনাটি গোয়েন্দা পুলিশকে হস্তান্তর করা হলেও গোয়েন্দা পুলিশও আগের সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। যদিও গতকাল বাবু ও রকি নামে দুই নিরিহ কিশোরকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। মতির আসল খুনি রনিকে না ধরে নিরিহ দুই কিশোরকে আটক করার কারণে গোয়েন্দা পুলিশের ভূমিকা রহস্যজনক বলে মনে করা হচ্ছে.....*

বাতেন খবরটি পড়ে বলল, স্যার, পত্রিকার খবরটি পুরোপুরি

একপেশে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমাদের একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠানো উচিত।

ইয়েস, বসের সাথে দৈনিক আজকের হালচালের খবরটি নিয়ে আমি ইতিমধ্যে ডিসকাস করেছি। তিনি জানিয়েছেন ওপর থেকে এ ব্যাপারে তাকে চাপ দেয়া হয়েছে। ব্যাপারটা তিনিও খুব সিরিয়াসলি নিয়েছেন। দ্রুত একটা প্রতিবাদ লিখে পত্রিকায় পাঠিয়ে দাও। এ ছাড়া ওই রিপোর্টারকে আমি আমাদের অফিসে তলব করছি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য বসের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিয়েছি। ওই ব্যাটা রিপোর্টারকে আমি ছাড়ব না।

এ সময় মি. হারিসের ফোন বেজে ওঠল। সেট থেকে রিসিভার কানের কাছে তুলে ধরে মি. হারিস বললেন, হ্যালো, কে বলছেন?

আমি দৈনিক আজকের হালচাল পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার রেজা রায়হান বলছি।

হালচাল পত্রিকার রিপোর্টার রেজা রায়হান এর নাম শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল মি. হারিস চৌধুরীর। তবুও নিজের রাগ প্রশমন করে সহজ-স্বাভাবিক ভাষায় বললেন, ওকে, বলুন কাকে চাচ্ছেন?

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর মি. হারিস চৌধুরী আছেন নাকি?

ইয়েস, বলছি। বলুন কী জন্য ফোন করেছেন?

দৈনিক আজকের হালচাল পত্রিকার রিপোর্টটি পড়েছেন?

হ্যাঁ পড়েছি।

পড়ে কী বুঝলেন?

পড়ে বুঝলাম নিউজটি খুবই দুর্বল, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, একপেশে। আরো ক্লিয়ার করে বলতে গেলে বলতে হয় একটা বাজে রিপোর্ট হয়েছে।

বাজে রিপোর্ট বলছেন কোন এঙ্গেল থেকে? এটা তো একটা অনুসন্ধানি প্রতিবেদন।

নিশ্চয়ই রিপোর্টটি আপনি করেছেন?

কে করল সেটা তো ইমপর্টেন্ট নয়।

ইয়েস, ইউ আর রাইট, তবে যিনিই রিপোর্টটি করেছেন তিনি ভালো সাংবাদিক নন মোটেও। সে যাক, আপনাকে একটু আমার অফিসে আসতে হবে।

কেন কেন, আপনার অফিসে আসতে হবে কেন?

আমার ধারণা লাইট হাউজের কিশোর মতি খুনের ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে কিছু ইনফরমেশন পাওয়া যাবে।

আমি তো নিউজে অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছি। আপনারা দু'জন নিরিহ কিশোরকে ধরলেও আসল খুনি রনিকে ধরছেন না কেন?

কাকে ধরবো কিংবা জিজ্ঞাসা করবো-না করবো তা কি আপনাকে জানিয়ে করতে হবে? হু আর ইউ? ওকে আপনার সাথে পরে কথা হবে। আজ বিকেল চারটায় আমার অফিসে আসবেন। আপনার সাথে তখন কথা হবে। এখন রাখি...

মি. হারিস সাংবাদিক রেজা রায়হানের সাথে ফোনে প্রথম দিকে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বললেও শেষ দিকে এসে রেজা রায়হানের কথায় কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই কথা না বাড়িয়ে ফোন রেখে দিলেন। আজকের হালচালের নিউজ পড়ে এবং রেজা রায়হানের সাথে কথা বলে মনে হয়েছে মতির বন্ধু রনিই এ ঘটনার সাথে পুরোপুরি জড়িত। বাস্তবে তিনি তা মনে করছেন না। কারণ রনিকে না পাওয়া মানেই এই নয় যে, রনি এই খুনের সাথে জড়িত।

মি. বাতেনও তা মনে করে। মি. বাতেন তার ধারণার কথা বসকে জানাল।

বস আমার ধারণা রনি মতিকে ডেকে নিয়ে গেলেও এ খুনের সাথে ও জড়িত নাও থাকতে পারে।

হ্যাঁ, আমার ধারণাও তাই। হয় রনিকেও খুনিরা হত্যা করেছে অথবা মতিকে মেরে রনিকে কিডন্যাপ্ট করেছে। রকিটা খুবই চালাক। সহজে কথা বের করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে আমি পুরোপুরি সিউর যে বাবু ও রকি মতির খুনের ব্যাপারে অনেক ইনফরমেশনই জানে।

ইয়েস স্যার। মি. বাতেন বসের কথায় সায় দিল।

বিকেল চারটা নাগাদ সাংবাদিক রেজা রায়হান এল এস. বি. অফিসে। মি. হারিস চৌধুরী রেজা রায়হানের সাথে কথা বললেন। কথা বলে মি. হারিস চৌধুরী বুঝতে পারলেন একটি মহল রেজা রায়হানকে ব্যবহার করছে। আর সে মহলটি বাবু ও রকির রিলেটিভ কেউ।

সাংবাদিক রেজা রায়হানের সাথে কথা বলা শেষ করে মি. হারিস তাকে ছাপছাপ জানিয়ে দিলেন তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে রেজা রায়হান যেন ঢাকা ত্যাগ না করেন।

মি. হারিস চৌধুরীর কথায় রেজা রায়হান কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বিষণ্ন মনে হারিস চৌধুরীর অফিস ত্যাগ করলেন।

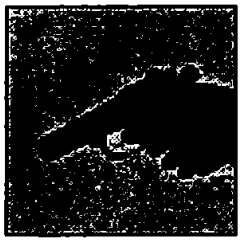

হত্যারহস্য উদঘাটন

রকি ও বাবুকে দ্বিতীয় দফা জিজ্ঞাসাবাদ করার প র আসল খবর বেরিয়ে আসতে শুরু করল। জানতে পারলেন এক তুচ্ছ ঘটনায় লাইট হাউজের কিশোর মতি খুনের আসল রহস্য।

ঘটনার দিন বিকেলে মতির বন্ধু রনি মতিকে প্রতিদিনের মতো ক্রিকেট খেলার জন্যই ডেকে নিয়ে যায়। এতে রনির কোনো প্রকার গোপন দুর্বিসন্ধি কিংবা ষড়যন্ত্র ছিল না। কিন্তু মতির অন্য বন্ধুদের মধ্যে রকি, বাবু, মোহন, শিপু ও তারেক পূর্ব থেকেই খেলার মাঠের উত্তর পাশে অবস্থিত তারেকদের বাড়িতে ওত পেতে ছিল। ওদের উদ্দেশ্য সন্ধ্যা হবার সাথে সাথে মতিকে ধরা। কারণ ঘটনার চারদিন আগে মতি বন্ধু শিপুর কাছ থেকে একশ টাকা লোন নেয় পরের দিন ফেরত দেবে বলে। পরের দিন মতি টাকা ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়। এই নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কথাকাটাকাটি এবং একপর্যায়ে হাতাহাতি হয়। মতির এক ঘুষিতে শিপুর নাক ফেটে রক্ত ঝরে। পরে বাবু, মোহন ও রকি এসে তখনকার মতো দুই বন্ধুর বিবাদ মিমাংসা করে। তবে বাবু, মোহন ও রকির সাপোর্ট যায় শিপুর পক্ষে। তাদের বিচারে নাক ফাটানোর দায়ে মতি দোষী সাব্যস্ত হয়। তারা তাৎক্ষণিক বিচার করে রায় দেয় লোনের একশ টাকাসহ মতিকে মোট একহাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। মতি বন্ধুদের এ রায় মানে না।

টাকা না দিয়ে মতি বলল, তোদের এ একপেশে রায় আমি মানি না। আমি একশ টাকার বেশি একটা টাকাও দেব না।

না টাকা তোকে দিতেই হবে। মোহন বলল।

বলছি তো টাকা আমি দেব না। মতি বলল।

ঠিক আছে, এর মজা তুই বুঝতে পারবি। শিপু বলল।

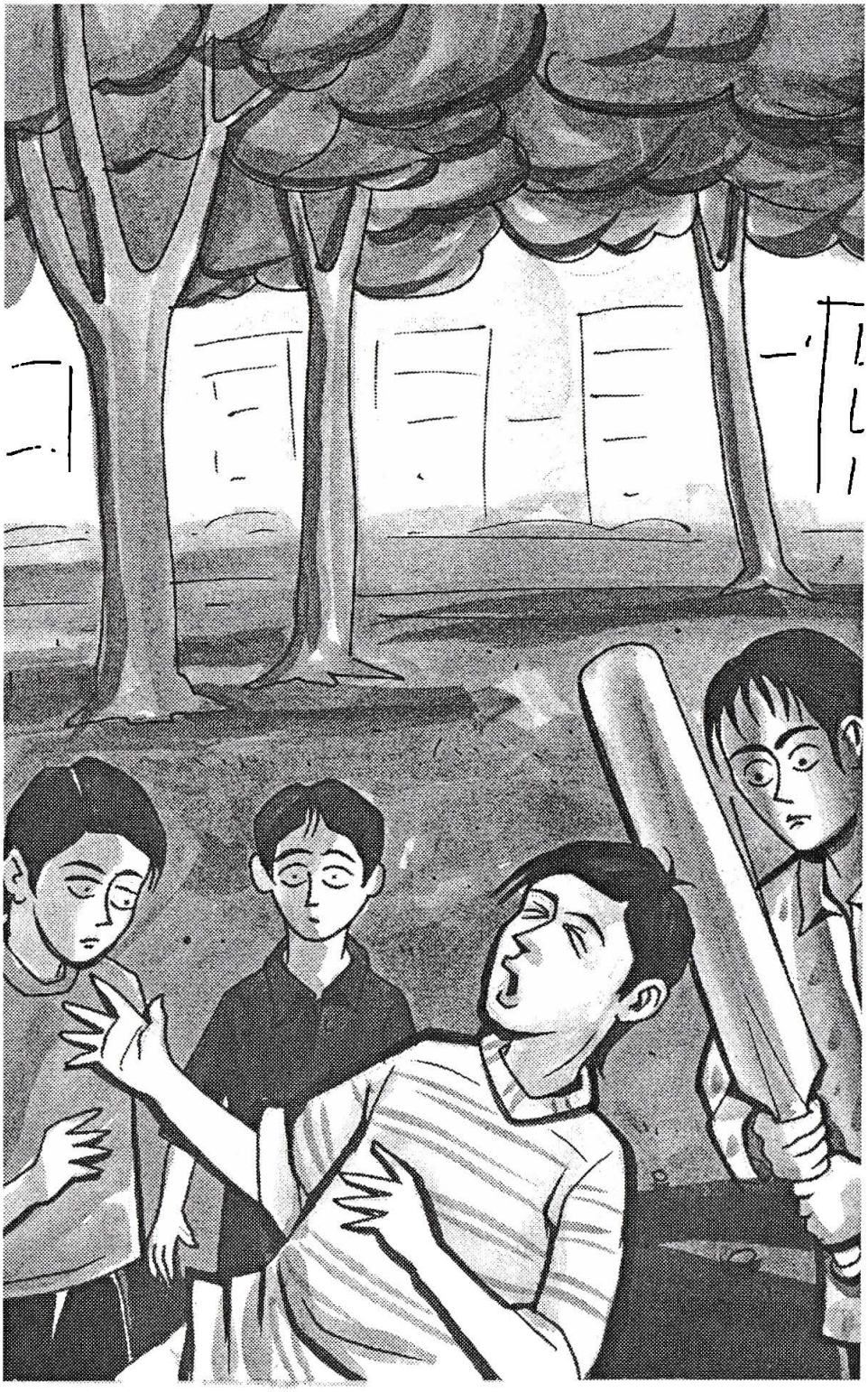

মতি বুঝতে পারল মাঠে সে একা। আজ তার কাছের বন্ধু রনিও আসেনি। ওদের সাথে বেশি বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। তাই কথা দীর্ঘ না করে মাথা নিচু করে তখনকার মতো মাঠ ত্যাগ করল।

এদিকে শিপুর জিদ একটুও কমে না। সে ভেতরে ভেতরে প্রতিশোধের চেষ্টায় কৌশল পাকাতে থাকে। রকি, বাবু, মোহন ও তারেককে নিয়ে দল পাকায়। বন্ধুদের সাথে পরামর্শ করে মতিকে পেটানোর। মতি খেলার মাঠে এলেই যে কোনো উছিলায় তার ওপর চড়াও হবে তারা।

তারা অপেক্ষায় ছিল ঘটনার আগের দিন মতিকে ধরবে। কিন্তু সেদিন রনি খেলতে গেলেও মতি যায়নি। তাই মতিকে পেটানোর দুর্বিসন্ধি সেদিন ভেস্তে যায় শিপুদের। ঘটনার দিনও তারা তারেকদের বাসায় অপেক্ষা করতে থাকে মতি কখন খেলার মাঠে আসবে সে আশায়। একসময় তাদের অপেক্ষার পালা শেষ হয়। দেখে রনি আর মতি খেলার মাঠে ঢুকেছে। তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে মোহন আর তারেক মাঠে ঢুকে। ওদের দেখে মতি প্রথমে একটু আশঙ্কা করলে মোহন আর তারেকের বিহ্যাভে ধারণা করে পরিস্থিতি হয়ত স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সে আর রনি মোহন আর তারেকের সাথে ক্রিকেটও খেলে। খেলার মাঝামাঝি সময়ে এসে শিপু, রকি ও বাবু যোগ দেয়।

সন্ধ্যা পাঁচটার দিকে খেলা শেষ হয়। শীতের সময় বলে পাঁচটার দিকেই অন্ধকার নেমে আসে। মাঠে খেলতে আসা অন্যসব শিশুরাও একে একে মাঠ ত্যাগ করে। ইচ্ছে করেই শিপুরা তাদের খেলা দীর্ঘায়িত করে। আরো পাঁচ ওভার খেলার সিদ্ধান্ত নেয়। তা বুঝতে পারে না মতি ও রনি। তারা পাঁচ ওভার খেলতে রাজি হয়। এক পর্যায়ে তাদের খেলা শেষ হয়। শেষ হয় বটে, কিন্তু একটা বল লেট থ্রোর অভিযোগ করে মতির সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে শিপু। মতি কিছুটা প্রতিবাদ করার সাথে সাথে তার ওপর শুরু হয় সকলের কিল, ঘুষি আর লাথি। রনি মতিকে বাঁচাতে গিয়ে সেও কিল, ঘুষি খায়।

একসময় মতির মাথায় ব্যাট দিয়ে শিপু আঘাত করে। মতি সাথে

সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। এতে ভরকে যায় শিপুরা।

রনি পরীক্ষা করে বুঝতে পারে তার বন্ধু মারা গেছে। সে ক্ষ্যাপে ওঠে। চিৎকার করে শিপুদের উদ্দেশ্যে বলল, তোরা এটা কী করলি! মতি তো মারা গেছে।

মোহন এগিয়ে এসে দেখে সত্যি সত্যি মতি মারা গেছে।

এখন উপায়? বাবু বলল।

উপায় আর কী, ওর লাশ গুম করতে হবে। তারেক বলল।

লাশ গুম করবি? আমি সব বলে দেব। রনি প্রতিবাদ করল।

ও এই কথা? তুই বলে দিলেও কোনো কাজ হবে না। আমরা পুলিশকে বলব তুইও জড়িত ছিলি। যদি বাঁচতে চাস চুপচাপ পালিয়ে যা। পুলিশ তোকেও ছাড়বে না। শিপু বলল।

রনি ভয় পেয়ে যায়। সে মতিকে রেখে দৌড়ে পালায়।

ভয়ে বাড়িতেও যায় না রনি।

এদিকে অন্য বন্ধুরা মিলে মতির লাশ খিলগাঁওয়ের এক ডোবায় ফেলে দেয়ার পরিকল্পনা করে এবং সে মোতাবেক মতির লাশ তারেকদের মোটরকারে করে ডোবায় নিয়ে ফেলে দেয়। যা পরের দিন পুলিশ উদ্ধার করে। ঘটনার পর থেকে বন্ধুদের পরামর্শ অনুযায়ি বাবু ও রকি লাইট হাউজের দিকে নজর রাখে পরিস্থিতি কোন দিকে যায় দেখার জন্য। দেখতে গিয়ে তারা ধরা পরে।

পুনশ্চ:

বাবু ও রকির জবানবন্দী অনুযায়ি এক এক করে তার অন্য বন্ধুরাও ধরা পরে। রনিকে পাওয়া যায় তার এক খালার বাসায়। রনির জবানবন্দী নিয়ে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়।

দৈনিক আজকের হালচাল পত্রিকাও তাদের ভুল রিপোর্টের জন্য ক্ষমা চেয়ে খবর ছাপে।

আদালতে মতি হত্যার দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

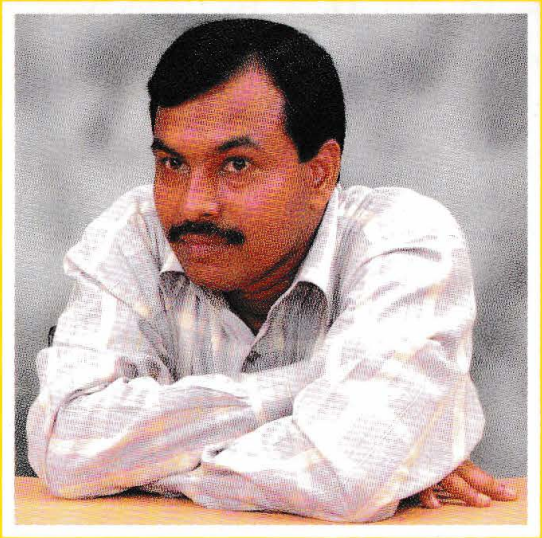

হুমায়ূন কবীর ঢালীর জন্ম ১৯৬৪ সালের ৩০ অক্টোবর, ১৫ কার্তিক ১৩৭১ গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ। পৈত্রিক নিবাস চাঁদপুর জেলার মতলব থানার শিকিরচর গ্রামে।

তাঁর লেখালেখির শুরু লিটল ম্যাগাজিনে কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে। এরপর সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় বিচরণ করছেন গত দু'দশক ধরে। দেশের প্রধান প্রধান পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন।

তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য– দুষ্টু ছেলের গল্প, তোমার চোখের জল, টিয়ে পাখির জন্মদিনে, বিলাইনেংটি, কাটুস কুটুস, কাকের ছা কঙ্কাবতী, এক যে ছিল হাঙর, কালোমূর্তির সন্ধানে প্রভৃতি। শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ে তার প্রবন্ধগ্রন্থ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাম্প্রতিক চালচিত্র সুধিমহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত হয়। তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ টিয়ে পাখির জন্মদিনে'র ইংরেজি অনুবাদ On the Birthday of A Parrot এ বছর তুরস্কের একটি বেসরকারি স্কুলের (Keben priamary school, TURKEY) পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনূদিত হয়েছে ফিলিপিন ভাষায়ও।

শিশুকিশোরদের জন্য লিখতে তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। শিশুকিশোরদের শব্দ ও ভাষার ব্যবহারের উপর ইউনিসেফ, সেভ দ্য চিলড্রেন (ইউএসএ) এবং প্ল্যান বাংলাদেশ-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ও আহসানিয়া মিশন আয়োজিত বিশেষ কোর্স সম্পন্ন করেছেন।

লেখালেখির স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ইতিমধ্যে অতীশ দীপঙ্কর গবেষণা পরিষদ স্বর্ণপদক, সালেহীন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড, কবি আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ স্বর্ণপদক, চিলড্রেন এন্ড উইমেন ভিশন ফাউন্ডেশন পদক ও নওয়াব ফয়জুননেসা স্বর্ণপদক-২০০৮ এ ভূষিত হন।